KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M T SMER LANE, KOLKATA-700009

Record No. : KLMLGK 2007	Place of Publication: 28 (চৌরিঙ্গী রোড, কলকাতা-26
Collection: KLMLGK	Publisher: অরুনকুমার সরকার (অরুনকুমার সরকার)
Title: সমকালীন (SAMAKALIN)	Size: 7"x9.5" 17.78x24.13 c.m.
Vol. & Number: 22/- 22/- 22/- 22/- 22/-	Year of Publication: মাঘ ১৩৮০ ।। Feb 1974 ফাল্গুন ১৩৮০ ।। March 1974 ভাদ্র ১৩৮১ ।। Sep 1974 কার্তিক ১৩৮১ ।। Nov 1974 অগ্রহায়ণ ১৩৮১ ।। Dec 1974
	Condition: Brittle Good
Editor: অরুনকুমার সরকার (অরুনকুমার সরকার)	Remarks:

CD Roll No. : KLMLGK

সমকালীন : প্রবন্ধের মাসিকপত্র

সম্পাদক : আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত

সমকালীন

ত্রয়োবিংশ বর্ষ ॥ কার্তিক ১৩৮১

দ্বাবিংশ বর্ষ ৭ম সংখ্যা ৯ কার্তিক তেরশ' একাশী

সমকালীন ॥ প্রবন্ধের মাসিক পত্রিকা

সূচীপত্র

সম্পাদক ॥ আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত

আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত কর্তৃক মডার্ণ ইণ্ডিয়া প্রেস ৭ ওয়েলিংটন স্কোয়ার হইতে মুদ্রিত ও ২৪ চৌরঙ্গী রোড কলিকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত

জার্মাণীর জেলে সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

সোমেন্দ্রনাথ বসু

১৯৩৩ সালের ২৩ শে এপ্রিল ইতালির মেরানো থেকে জার্মাণীতে আসছিলেন সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর। এক বছরের কিছু বেশী সময় তিনি ইতালিতে ছিলেন স্বাস্থ্য সারানোর জন্যে। তাঁর এক বন্ধু পরিবার-স্বামী স্ত্রী ও তাঁদের দুটি সন্তান—তাঁর সঙ্গে ছিলেন একই মোটরে।

সীমান্তের জায়গাটির নাম কুফস্তেন। গাড়ি এসে থামলো। পাসপোর্ট পরীক্ষা করে সরকারী লোকেরা। একটি পুলিশের লোক এসে দেখতে চাইলে পাসপোর্ট। অন্যদের পাসপোর্টগুলি দেখা হয়ে গেল, ফেরৎও হলো। কিন্তু সৌম্যেন্দ্রনাথের পাসপোর্টটি হাতে পেয়ে মুখভাব বদলে গেল ঐ সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর। ভিতরে চলে গেল অফিসের। ফিরে এসে বললে—অফিসের ভিতরে আসুন। অফিসে এক তাগড়াই জার্মাণ বসে। জানতে চাইলে—তুমিই কি চেগোর কলকাতায় জন্ম ১৯০১ সালে। উত্তরে যখন জানা গেল যে তার সংবাদ সত্য সে হুকুম করলে ওভার কোট খুলতে, তাঁর সারা দেহ তল্লাসী হল। তারপরেই গ্রেপ্তার। সৌম্যেন্দ্রনাথ জানতে চাইলেন কেন তাঁকে গ্রেপ্তার করা হল। উত্তরে শুনলেন মিউনিক পুলিশ ষ্টেশনে এর কারণ তিনি জানতে পারবেন।

পাশের ঘরে যখন নিয়ে যাওয়া হল তিনি দেখলেন তাঁর ঐ বন্ধু পরিবারটিকেও শিশু দুটিসহ গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আরও একবার দেহ তল্লাসী হল, গাড়ি তল্লাসী হল—বন্ধুপত্নী ও তাঁদের সন্তান দুটিকে টেনে পাঠানো হলো মিউনিকে। বন্ধু ও সৌম্যেন্দ্রনাথ ঐ গাড়িতেই যথোচিত পুলিশ প্রহরায় মিউনিকে গেলেন।

তখন দিনের আলো ডুবিয়েছে—ঘনিয়ে এসেছে সন্ধ্যা। গাড়ি এসে থামলো মিউনিকের হেড কোয়ার্টার্সে। দরজা খুলে ভিতরের প্রাঙ্গণে পুলিশ কর্তৃপক্ষ ঢুকিয়ে নিলেন গাড়ি। পিছনে দরজা বন্ধ

হয়ে গেল। দুজনকেই তিনতলায় নিয়ে গেল পুলিশ। তারপর বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলেন দুজনে। ১৩ নম্বর মেলের দরজা খুলে গেল। কর্কশ কণ্ঠে এল ভিতরে যাওয়ার হুকুম—তারপর সেলের দরজায় আবার তালা পড়ে গেল।

বেশ বড় ঘরটা, তেইশ জন বন্দী তখন রয়েছেন সেখানে। কাঠের পাটাতন দেয়াল সংলগ্ন। সেখানে আর জায়গা নেই। মাটিতে খড়ের বিছানা পেতে সারা দিনের ক্লান্ত শরীরটা ছড়িয়ে দিলেন সৌম্যেন্দ্রনাথ।

কিন্তু শুতে দিচ্ছে কে? আবার লোক এলো ডাকতে। এবার জিজ্ঞাসাবাদ হবে খোদ বড় কর্তার কাছে। মিটনিকের পুলিশ-প্রধানের ঘরে গিয়ে হাজির হতে হলো। একটা লম্বা লোক, হিংস্রতার রূঢ় প্রলেপ মাখানো মুখে। পুলিশপ্রধান বললেন,—বন্ধুপত্নী বিশ্বাসঘাতকতা করেছে তোমার প্রতি, সব বলে দিয়েছে, আর লুকিয়ে কি করবে? উত্তর দিলেন সৌম্যেন্দ্রনাথ—'মিসেস ভেগসাক যদি কিছু বলে থাকেন, সত্য কথাই বলেছেন, তাতে আমার ভয় পাবার কিছু নেই।' তারপর জেরা চললো—

'তুমি জার্মাণীতে এসেছ কেন?'

'আমার অসুস্থতা ডাক্তাররা যক্ষারোগ বলে জানিয়েছেন। জার্মাণীতে সেই ডাক্তারদের সঙ্গে দেখা করতে এসেছি। বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করতেও বটে। কিন্তু আমায় যে গ্রেপ্তার করা হলো তার কারণটা কি?'

'জানতে পারবে, সবই পরে যথা সময়ে জানতে পারবে। আচ্ছা, তোমাদের গাড়ির পিছনে পিছনে যে গাড়িটি তোমাদের অনুসরণ করছিল সে গাড়ির লোকেরা কোথায় গেল।'

'আমি তার কি জানি, হাজার হাজার গাড়ি যাচ্ছে আসছে, আমাদের যে কেউ অনুসরণ করছিলো তা আমার জানার কথা নয়।' একটা বর্বর দৃষ্টি হেনে পুলিশকর্তা বললেন—'তাদের সবাইকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে সব জানি আমরা।'

তারপর কিছুক্ষণ বসিয়ে রাখা হলো করিডরে। বৃটিশ কনসালে খবর পাঠাতে চাইলেন সৌম্যেন্দ্রনাথ; বলা হলো তা দেওয়া হবে না এবং যতক্ষণ না সব খবর জানা যাচ্ছে ততক্ষণ বন্দীশালার জীবন ছাড়া তাঁর গতি নেই।

ফিরে যখন এলেন ঘরে তখন ক্লান্ত শরীর আর টানতে পারছে না। সেই খড়ের বিছানায় রাজ্যের ঘুম নেমে এলো চোখে।

পরদিন ঘুম ভাঙলো অনেক সকালে। তখনো বন্দীরা জাগে নি। যখন আর একটু বেলা বাড়লো, ঘুম ছেড়ে উঠলো সবাই। তরুণ ছেলের দল ধরে এনেছে হিটলারের পুলিশ। তারা অনেকেই বুঝে নিয়েছে যে এ জীবনে এ কারাগারের দ্বার আর খুলবে না তাদের। সেই বিবর্ণ মুখগুলিতে অনেক দিন সূর্যের আলো পড়েনি, খোলা বাতাসের ছোঁয়াও লাগেনি। অনেকের সর্বাঙ্গে অত্যাচারের চিহ্ন।

একটু পরে জেল সাফ করার লোক এলো। ঘরের বাইরে ছোট করিডরে বেরিয়ে এলেন সবাই। সেখানেও জানলা অনেক উঁচুতে—অনেক কষ্ট করে মাথা তুলে দেখা যায় একটু আকাশ, এক টুকরো নীলিমা। পাহারা দিচ্ছে দুটো হিটলারী প্রহরী। তাদের কথাবার্তায় বার বার নিজের নাম উচ্চারিত হতে শুনলেন সৌম্যেন্দ্রনাথ।

ঘর পরিষ্কার হল, বন্দীরা ফিরলেন ঘরে। মেঝে ভিজিয়ে দিয়েছে জলে। কাঠের পাটাতনে পাশাপাশি বসলেন সবাই। বিম্‌লার নামে এক বন্দী অন্য এক বন্দীর হাত দিয়ে একটি চিরকুট পাঠালেন সৌম্যেন্দ্রনাথকে;—মুখে কিছু বললেন না, কারণ কে জানে বন্দীদের মধ্যেই হয়তো হিটলারের গুপ্তচর বাস করছে কেউ—সেই চিরকুটে লেখা ছিল, 'প্রহরীদের কথা থেকে জানলুম যে, হিটলার হত্যার চেষ্টায় আছো বলে তোমায় গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তারা তোমায় গুলী করে মারবে।' সেই প্রথম সৌম্যেন্দ্রনাথ জানলেন তাঁর গ্রেপ্তারের কারণ।

যে বন্দীর হাত থেকে চিরকুটটি পেলেন সৌম্যেন্দ্রনাথ তারই মুখের দিকে চাইলেন সহাস্য বদনে। সেই বন্দী বললেন, 'খুব গুরুতর অভিযোগ। তোমার জীবন নিয়ে বেরুতে পারবে কিনা খুব সন্দেহ।'

মুখে নির্ভীক হাসি নিয়ে সৌম্যেন্দ্রনাথ বললেন, 'তা নিয়ে আমার খুব মাথাব্যথা নেই; তুমি তো জানোই কমরেড আমরা কমিউনিষ্টরা আমাদের জীবনটা পকেটেপুরে নিয়ে ঘুরে বেড়াই। বিনা দ্বিধায় যে কোন মুহূর্তে তা ছুঁড়ে ফেলে দিতে পারি।'

দুজনেই হাসলেন। সেই বন্দী বললেন, 'তোমাকে দিয়ে এরা প্রমাণ করতে চাইবে যে হিটলারের শাসনের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র কত বড় আকার ধারণ করতে পারে। প্রচারের শিখণ্ডী করে তোমায় ব্যবহার করা হবে।'

সৌম্যেন্দ্রনাথ বললেন, 'কিন্তু, সেই সঙ্গেই এও প্রমাণ হবে যে হিটলারের শাসন কতদূর বর্বর।'

সেই কারাগারেই সৌম্যেন্দ্রনাথ দেখলেন, কিছু কিছু বন্দীর উপরে কি প্রচণ্ড অত্যাচার চলেছে। নতুন নতুন তরুণ বন্দী আসতে লাগল। হিটলারের জেল তখন ভরে উঠছে। জেরার নাম করে ডেকে নিয়ে যাচ্ছে, আহত রক্তাক্ত অবস্থায় ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে যাচ্ছে। সৌম্যেন্দ্রনাথ লিখছেন, 'হঠাৎ বাইরে থেকে একটা আর্ত চীৎকার ভেসে এলো। আমাদের তলাতেই কাউকে মারছে। আমরা সবাই উঠে বসলুম, আমার বুকের মধ্যে দাপাদাপি সুরু হয়ে গেল। কমরেডদের মুখ বিবর্ণ। সবাই চুপ, মৌনতা চারদিকে। মার আর উচ্চস্বরে কান্নামেশানো চীৎকার চললো খানিকক্ষণ তারপর আস্তে আস্তে মিলিয়ে গেল।'

পরের দিন সকালে দীর্ঘদেহী এক সুন্দর মুখাবয়ব পুরুষকে ঢুকিয়ে দিয়ে গেল সেলে। বাঁ হাত ব্যাণ্ডেজ বাঁধা, চোখের নীচে রক্তের দাগ, চলবার ক্ষমতা নেই। কি নির্মমভাবে তাঁকে মেরেছে। সবাই মিলে ধরে তাঁকে শুইয়ে দিলেন। তাঁর নাম ফ্যুরার।

ফ্যুরার সৌম্যেন্দ্রনাথের সঙ্গে পরিচয় হতে বললেন, 'ও, তুমিই সেই ভারতীয় টেগোর। আন্তর্জাতিক প্রচারের জন্য তারা বিদেশীদের ধরে। কিন্তু তোমায় ধরে তারা খুব ভুল করেছে।'

সৌম্যেন্দ্রনাথ পাশে বসলেন; সেই ক্ষতবিক্ষত মানুষটির মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন। ছুচোখে জল ভরে, মৃদু কণ্ঠে ফ্যুরার বললেন, 'টেগোর, তুমি যখন বাইরে যাবে আমাদের জন্যে কিছু কোরো।' সৌম্যেন্দ্রনাথ বললেন, 'বাইরে যেতে পারব কিনা জানি না, তবে যদি যাই নিশ্চয়ই চেষ্টা করব এই বর্বরতার কাহিনী সকলের সামনে তুলে ধরতে।' সেদিন সৌম্যেন্দ্রনাথ দেখেছিলেন এই মারখাওয়া, নৈরাশ্যের অন্ধকার সমুদ্রের সামনে দাঁড়ানো মানুষটির মনের জোর, আর বীরত্ব। ফ্যুরার বলেছিলেন 'আমার স্ত্রীকে একটা চিঠি লিখতে চাই। সে ভিয়েনাতে আছে। আর তো এখান থেকে বেরুতে

পারব কিনা জানি না। তাই তাকে জানিয়ে দিতে চাই সে এখন স্বাধীন।' গলার স্বর কেঁপে গেল। সৌম্যেন্দ্রনাথ মুগ্ধ-বিস্ময়ে তাকিয়ে রইলেন সেই কঠিন, মহৎ, সুন্দর মুখের দিকে। ভাবলেন, কি অসাধারণ বীরত্ব, কি স্বার্থত্যাগ; আর ভাবলেন এই কমরেডদের তুলনায় তিনি কি ক্ষুদ্র কি অকিঞ্চিৎকর।

নতুন লোক যারা বন্দী হয়ে আসে তারা প্রথমেই দেখতে চায় সেই ভারতবর্ষের আশ্চর্য মানুষকে যে হিটলারকে মারবার ষড়যন্ত্র করেছে। তারাই বলে, পত্রিকায় বেরিয়েছে যে হারকিউলিসের চেহারার একজন ভারতীয় হিটলার হত্যার চেষ্টার ফলে গ্রেপ্তার হয়েছে। আর এমনই যোগাযোগ যে সেই গ্রেপ্তারের দিনেই সত্যি সত্যি হিটলার এসেছিলেন মিউনিকে। সুতরাং প্রমাণ করতে কষ্ট কি যে সৌম্যেন্দ্রনাথ ঐ হত্যার মতলবেই মিউনিকে এসেছিলেন।

রবিবারে গ্রেপ্তার হয়ে এসেছিলেন। সোমবার গেল। মঙ্গলবারে বিকালে আবার জেরা। দেখা গেল তাঁর অতীত কাহিনী তারা সব জানে। ভারতবর্ষে শ্রমিক-চাষী আন্দোলনের সঙ্গে যোগের খবর তাদের অজানা ছিল না। সেই প্রথম সরকারীভাবে জানান হল তাঁর অপরাধের কথা।

ছবি তোলা হল; আঙুলের ছাপ নেওয়া হল। ছাপ নেওয়ার লোকটি বললে—'তোমার এবার সব শেষ। হিটলারকে গুলী করতে এসেছিলে। দেখ তোমার কি হয়।'

রাত্তিরে আবার জেরা। এবার একটু নতুনত্ব হাতে হাতকড়া পরিয়ে নিয়ে যাওয়া হলো।

বুধবার সেল বদল হলো। চাবির গর্তের ফাঁক দিয়ে নতুন সেলের প্রহরীরা উঁকি মেরে দেখতে লাগলো হিটলার হত্যার ষড়যন্ত্রকারীকে।

বৃহস্পতিবার বিকালে পলিটিক্যাল ডিপার্টমেণ্টে ডাক পড়লো। তারা জানালো তাঁর বিরুদ্ধে কোন অভিযোগের প্রমাণ না পাওয়াতে তাঁকে ছেড়ে দিতে হলো।

পরের দিন সন্ধ্যাবেলায় সৌম্যেন্দ্রনাথ চলে গেলেন প্যারিসে।

প্যারিসের একটি পত্রিকায় তাঁর লেখা বেরুলো, 'হিটলারের হবু হত্যাকারী হিসাবে আমার গ্রেপ্তার এবং মিউনিক জেলে আমার অভিজ্ঞতা।' সেই প্রবন্ধে তিনি জেলের নানা রকম অত্যাচারের কাহিনী বললেন এবং বললেন সোসালিষ্ট জার্মাণীর একটুকু স্মৃতিই রইলো।

এর উত্তরে জার্মাণীর পুলিশ বৃটিশ কনসালকে জানালো যে সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ঠিককথা বলেন নি; তাঁকে গ্রেপ্তার করার সময়েই কারণ জানানো হয়েছিল এবং অনুসন্ধান শেষ হওয়া মাত্রই পুলিশ ছেড়ে দিয়েছে এবং সৌম্যেন্দ্রনাথ নিজেই বলে গেছেন তাঁর অভিযোগ করার মত কিছু ঘটে নি। জার্মাণ পুলিশ আরও জানালো যে শুক্রবার টেগোর নিজেই পুলিশী দপ্তরে হাজির হয়ে সুব্যবহারের জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে গেছে।

জার্মাণ পুলিশের কথা যে সত্য নয়, এটি যে হিটলারী মিথ্যা প্রচারের কৌশল সে কথা প্রমাণ হয় মিউনিকের বৃটিশ কনসালের ১৬ই মে ১৯৩৩ সালের চিঠিতে। তাতে লণ্ডনের ফরেন অফিসকে কনসাল জানাচ্ছেন—যদিও জার্মাণ পুলিশ বলছে সৌম্যেন্দ্রনাথ স্বেচ্ছায় তাঁদের দপ্তরে ধন্যবাদ জানিয়ে গেছেন, তাঁরা কিন্তু আমাদের আগে জানিয়েছিলেন যে মুক্তি দেওয়া হলেও মিউনিক ছাড়ার আগে তাদের কাছে সৌম্যেন্দ্রনাথকে রিপোর্ট করতেই হবে।

ইতিমধ্যে ২৭শে এপ্রিল ইংলণ্ডের হাউস অফ কমন্সে কর্ণেল ওয়েজউড প্রশ্ন করলেন সৌম্যেন্দ্রনাথের জার্মাণীতে গ্রেপ্তার সম্পর্কে কি ব্যবস্থা নিয়েছেন ইংরেজ সরকার। উত্তরে জানা গেল মিউনিকের কন্সাল জেনারেলকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এ ব্যাপারে সন্ধান করার জন্য।

সৌম্যেন্দ্রনাথ ছিলেন কমিউনিজমের আদর্শে পূর্ণ বিশ্বাসী। ব্যক্তিগত হত্যার সম্ভাবনাবাদ যে তাঁর পথ ছিল না এ কথা বার বার বলেছেন। হিটলারকে হত্যা করলেই যে জার্মাণীতে ফ্যাসিজমকে ঠেকানো যাবেনা এ কথা তখনই বলেছেন। হিটলারের বিরুদ্ধে তাঁর আসল লড়াইটা হলো আরও দূর প্রসারী। তিনি ইউরোপেই হিটলারের অত্যাচার, ফ্যাসিজম, প্রভৃতি বিষয় নিয়ে প্রবন্ধ লিখতে থাকলেন। পরে ভারতবর্ষে ফিরে এসে একটি পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ প্রকাশ করলেন, 'হিটলারিজম অর দি এরিয়ান রুল ইন জার্মাণী।' সে গ্রন্থ প্রকাশ পাওয়া মাত্র ভারতের ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদীদের প্রাণ কেঁদে উঠলো হিটলারের প্রতি গভীর বন্ধুত্বের বেদনায়। সে আর এক কাহিনী, দ্বিতীয় পর্যায়ে বলা যাবে।

দিল্লীর ন্যাশনাল আর্কাইভসে হোম ডিপার্টমেণ্টের ৬৩।৩৩ পল সংখ্যক ফাইলে সৌম্যেন্দ্রনাথের গ্রেপ্তার সম্পর্কে তিনটি মূল্যবান চিঠি আছে। উপরের কাহিনীতে সে চিঠিগুলি থেকে উপাদান সংকলিত হয়েছে। এখন নীচে আসল চিঠিগুলি ইংরাজীতেই তুলে দেওয়া গেল।

(I) P. & J. (S) 531/1933 British Consulate-General,
No. 16 Munich, 2nd May 1933

Sir,

With reference to my telegram nos 2 and 3 of the 27th and 28th April respectively. I have the honour to report that Mr. Saumyendranath Tagore was released on the evening of the 27th instant with instructions to report to the police on the next day. After he had duly reported he left Munich on the 28th April for Paris.

2. I have maintained close touch with the Bavarian state chancery and the Political Police regarding this case and the state chancellor has now informed me that the suspicious upon which Mr. Tagore was detained proved upon closer examination to be unfounded and that he was therefore released at the earliest possible moment.

3. Mr. Tagore did not apply for my assistance nor did he come to see me before his departure for Paris, and I am, therefore, unable to give any information as to the reasons for his arrest or the circumstances in which it took place, beyond that furnished to me by the Bavarian Government.

His Majesty's Principal Secretary of State for Foreign Affairs, Foreign Office, London. I have etc.,
Sd/-D. St. Clair-Gainer.

(2) British consulate General
P. & J. (s) 531/1933 Munich, 16th May, 1933.

Sir,

With reference to my despatch no. 16 of the 2nd May regarding the arrest and subsequent release of Mr. Saumyendranath Tagore, a British Indian, I have the honour to report that the Munich Police have issued an official statement that Mr. Tagore who was arrested on April with his companions at Kieferfelsen on Suspicion of plotting an attempt upon the Reich's Chancellor and who was brought to Munich has published in a Paris newspaper his experience under the title "My arrest as a would-be assassin of Hitler and my experiences in prison at Munich."

2. In this article, according to the Police report, Mr. Tagore complains of the excesses to which he was subjected to prison,—bad accomodation and food, cruel treatment of all kinds. Further he gives details of his transportation to the frontier and concludes by saying that these are the only memories he has of Nationalist Socialist Germany.

3. In reply the Police declared that Mr. Tagore's statements are not in accordance with the facts. Mr. Tagore and his Companions were informed of the reasons for their arrest when it took place; they were questioned at once and immediately set free when the Police had concluded their investigations. Both at the examination and when released Mr. Tagore and his Companions admitted that they had no ground at all for complaint, they expressed their appreciation of the treatment accorded them and said they were now satisfied of the inaccuracy of the atrocity stories about Germany and of the untrue reports regarding my conditions in German prison.

4. Mr, Tagore was not escorted to the frontier. After his release he remained one more day at Munich, while his companions left Germany at a much later date. Before his departure from Munich Mr. Tagore, together with his companions, appeared once more at police Headquarters, again expressed his thanks for the humane treatment accorded him and repeated his previous statements. There are a number of witnesses as to these facts.

5. The police report concludes with the naive remark that if he really made these statements in the Paris paper he should remember that 'abuse of

hospitality' is considered also in India as discourtesay.

6. As I had the honour to state in the last paragraph of my despatch under reference, Mr, Tagore did not attempt to see me after release, though he had an opportunity of so doing and that I have no information other than that given me by the Police and the Bavarian state chancery. It may, however, be noted that the Police state that Mr. Tagore called at Police Headquarters 'voluntarily' before his departure, while the Police informed me themselves that he had been released but had to report to them the next morning before leaving Munich.

I have etc.
Sd/ D. St. Clair-Gainer

His Majesty's Principal Secretary
of State for Foreign Affairs,
Foreign Office, Lonon.

(3) League Against Imperialism & for
National Independence
53, Gray's Inn Road
London, W. C. I.
May 8th, 1933

Sir,

I have been instructed by the Executive Committee of the British Section of the League against Imperealism to transmit to you herewith a copy of a statement made by the young Indian student Mr. Saumyendranath Tagore, who was arrested near the Austro-German frontier by the German authorities on April 23rd and brought under guard to the Police Headquarters at Munich, where he was Jailed without being informed of the charge against him.

After two days Mr. Tagore learnt from friends the reason of his arrest, which was that he had planned on attempt to assassinate the Chancellor of the Republic of Germany, The only way in which Mr. Tagore can explain this absurdly false charge is that it was made against him for propaganda purposes, both inside and out side Germany. Outside Germany this charge is intended to justify the terrorist methods of the Fascist Goverment in the

eyes of the world while in Germany itself the charge was an attempt to revive the waning sympathies of the German people for the fascist regime.

When the utterly false character of the charge was demonstrated Mr. Tagore was released and permitted to quit Germany.

You will remember that the matter was raised by Colonel Wedgewood in the House of Commons on April 27th and that in reply to his question whether any steps were being taken, and if so what, it was not certain that Mr. Tagore was a British Subject, but that His Majesty's Consul General at Munich had been instructed to make enquiries of the Bavarian authorities and that a report form that officer was on the way.

Mr. Tagore is one of our friends ; he is the grandson of the celebrated Indian poet Rabindranath Tagore, and in view of the outrageous treatment of which he has been the victim, I am instructed to enquire what action His Majesty's Government propose to take with a view to ensuring full apology and amends from the authorities responsible for this disgraceful treatment of a British Indian subject.

I am, etc
Sd/- Rejinald Bridgeman
Hon Sec.

The Right Honb'le Sir John Simons. M: P:
His Majesty's Principal Secretary of State
for Foreign Affairs, Foreign Department
Downing Street, S. W. I.

20-23/XI/34

কুণ্ডলিনী শক্তির বৈজ্ঞানিক তাৎপর্য

অমিয়কুমার মজুমদার

তান্ত্রিক সাধনার মূল লক্ষ্য হলো পূর্ণত্বলাভ করা এবং এই পূর্ণত্বলাভের জন্যে প্রয়োজন অপরিচ্ছিন্ন শক্তির সঙ্গে সংযোগসাধন। জীবের বন্ধন মানেই শক্তির সংকোচ। তাই শক্তির বিকাশ হলেই মানুষের মধ্যে আসে পূর্ণতা বা মুক্তি। তন্ত্র সাধনা সম্বন্ধে আমাদের দেশে নানারকমের ধারণা আছে। 'তান্ত্রিক' শব্দ শুনলেই আমাদের মনে পড়ে বঙ্কিমচন্দ্রের 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসের কাপালিককে। তাছাড়া 'মারণ', 'উচাটন', 'স্তম্ভন', 'বশীকরণ' ইত্যাদি কার্যকলাপ দেখে আমাদের সংস্কৃতিসম্পন্ন মন স্বভাবতই তন্ত্রের প্রতি বিষিয়ে আছে। এইসব অপকৃষ্ট ক্রিয়াকলাপ যারা করেন তাঁরা কখনোই পরমাশক্তির সন্ধান পান না এ বিষয়ে দ্বিমত নেই। অবশ্য 'মারণ', 'উচাটন', 'স্তম্ভন', 'বশীকরণ' ইত্যাদির নিগূঢ় ব্যাখ্যা আছে। প্রকৃত সাধকেরা নিজের উপরেই এই ক্রিয়া সম্পন্ন ক'রে নিজেকে আত্মমুখী ক'রে তোলেন। রিপু সমূহের দমন, স্তম্ভন ইত্যাদি করার পরে অশান্ত মনকে করেন বশীভূত। এবারে একাগ্র হয়ে আরাধনা করেন যাতে নিজের সুপ্ত শক্তি জাগরিতা হয়ে ব্রহ্মশক্তির সঙ্গে মিলিত হতে পারে।

অন্যান্য সাধন মার্গের মতো তন্ত্রেরও মূল উদ্দেশ্য সাধককে কুসংস্কার বিমুক্ত ক'রে মুক্ত মানুষে পরিণত করা। অনেকে বলে থাকেন, তন্ত্র হলো একটা ম্যাজিকের সিস্টেম অথবা অটো-সাজেসশনের বিস্তৃততর পদ্ধতি। যদি ম্যাজিক এবং অটো-সাজেসশনের গূঢ়ার্থ তাঁদের জানা থাকে তাহলে বলবো যে তাঁরা সত্যি কথা বলেছেন। অধিকাংশ বক্তারা বিষয়টিকে সম্যকভাবে উপলব্ধি না করেই মন্তব্য প্রকাশ ক'রে থাকেন। ম্যাজিক বলতে যদি আমরা অ্যালকেমির যুগের কাণ্ডকারখানাকে বুঝি তাহলে ভুল করা হবে। তন্ত্র হলো প্রাচীনতম বিজ্ঞান যার অন্যতম কাজ হলো ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি, ততসহ মানব সমাজের আবির্ভাবের মূল সূত্রগুলির পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা। এই বিজ্ঞানকে আশ্রয় ক'রে অগ্রসর হলে উচ্চতর প্লেনের শক্তির বিকাশ হয়। তাকে মানুষের কল্যাণের কাজে প্রয়োগ করা যায়। যেসব অপ্রাকৃত ঘটনা বা মিরাক্ল্ করতে দেখি অনেক ক্রিয়াবান মানুষকে তা একমাত্র সম্ভব হতে পারে যখন ক্রিয়াশীল মানুষের ইচ্ছা এবং জগন্মাতার ইচ্ছা এক হয়। এবং তা সম্ভবপর 'কুণ্ডলিনী'র কৃপাতে।

জড় বিজ্ঞানের যুগেও চৈতন্যশক্তিকে স্বীকার করছেন পাশ্চাত্যের শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানীরা। এ কারণে কুণ্ডলিনী শক্তি সম্বন্ধে আলোচনা করলে কিছুদূর পর্যন্ত পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের সাহচর্য লাভ করা যাবে। কুণ্ডলিনীর অন্য নাম হলো আধার শক্তি। ডঃ গোপীনাথ কবিরাজ বলেন, এই শক্তি যাবতীয় পদার্থকে আশ্রয় দিয়ে সকল পদার্থের মূল সত্তা রূপে বর্তমান আছে। কুণ্ডলিনী শক্তির চৈতন্য সম্পাদন করলে তা নিরাধার হয়ে যায়। আর কুণ্ডলিনী যখন নিরাধার তখন সব বস্তুই নিরাধার। আবার কুণ্ডলিনী যখন চৈতন্যময় হয় তখন বিশ্বব্রহ্মাণ্ডও চৈতন্যময় রূপ ধারণ করে। শাস্ত্রনির্দিষ্ট 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' অর্থাৎ সর্বত্র ব্রহ্মসাক্ষাৎকার ও ব্রহ্মময়তা অনুভবের সাধনা এবং কুণ্ডলিনীর জাগরণ প্রকৃত পক্ষে একই কথা।

অন্যান্য সাধন-পন্থা মানুষী সম্পদ ও বৃত্তিকে লঘুজ্ঞান করেছে, কিন্তু তন্ত্র তা করেনি। বরং তার পূর্ণতা সম্পাদন করার চেষ্টা করে। মানুষের ভিতরকার সুপ্ত রমণীয় ও বরণীয় শক্তির উদ্বোধন ক'রে

তন্ত্র-সাধনা মানুষের জীবনকে শুদ্ধতর, বৃহত্তর ও মহত্তর ক'রে তোলে। স্মৃতি ও মেধা প্রদীপ্ত হয়। সূক্ষ্মজ্ঞানের আলোকে প্রদীপ্ত হয় সাধকের মনোজগত। ভক্তি, যোগ, জ্ঞান এবং আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকর্ম সবকিছুই তন্ত্রে আছে। বলা যেতে পারে তন্ত্র বিশেষ কোন মতবাদের প্রতিষ্ঠা নয়, বরং জ্ঞানের পূর্ণ স্ফূর্তি আছে এর মধ্যে। সাধনার লক্ষ্যে পৌঁছাতে হলে যা কিছু প্রয়োজন তা সমাদরে গৃহীত হয়েছে তন্ত্রে।

ডঃ মহেন্দ্রনাথ সরকার বলেন, 'সাধনা বিশেষের সকল ইঙ্গিতই তন্ত্রে আছে। পারিবারিক ধর্ম, উপাসনাধর্ম, মোক্ষধর্ম, ধর্মচক্র প্রতিষ্ঠা সবারই বিবৃতি তন্ত্রে আছে। জীবনের সফলতার এমন পরিপূর্ণ নির্দেশ অন্যত্র অল্পই দৃষ্ট হয়। মনে হয়, তন্ত্র যেন সমস্ত গোটা জীবনের আলেখ্য। সারাজীবনকে সমষ্টির সত্তা হ'তে বিচ্ছিন্ন করে তন্ত্রে দেখা হয়নি। মানুষের সূক্ষ্ম দিব্য জগতের সহিত অবশ্যম্ভাবী সম্বন্ধ তন্ত্রে স্বীকৃত। জীবনের শোভনতর বিকাশ ও মহিমা এই দিব্য সত্তার সংস্পর্শে সার্থক হয়।'

তন্ত্রে দেবতাবাদ স্বীকৃত। দেবতা কি এ প্রশ্ন সহজেই উঠবে। বলা যেতে পারে শক্তির স্ফুটতর বিকাশ হল দেবতা। অবশ্য দানিকেনের 'দেবতারা কি গ্রহান্তরের মানুষ?' বিশ্বে আলোড়ন তুললেও মীমাংসিত সত্য নয়। কাজেই তাঁর বক্তব্যকে পরিহার করে বলতে পারি দেবতা হলেন মন্ত্ররূপী। আবার মন্ত্র হল ছন্দরূপী। ছন্দ হল অব্যক্ত শক্তির (পোটেনশিয়াল এনার্জি) ব্যক্ত বিকাশ। তাহলে দেখা যাচ্ছে ছন্দ মূর্ত হয় দেবতারূপে। 'আশ্বিন' সংখ্যার 'সমকালীন'-এ 'মন্ত্রের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা' প্রবন্ধে বলা হয়েছে যথাযথভাবে উচ্চারণ করতে পারলে মন্ত্র উজ্জীবিত হয়। শ্রীকৃষ্ণের বীজমন্ত্র 'ক্লীং'। ক্লীং বা ক্লী—এই বীজমন্ত্রটিকে নানাভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। তার জটিলতায় না গিয়ে আমরা বলতে পারি যে শ্রীকৃষ্ণের যে রূপ আমাদের কাছে বর্ণিত হয়েছে তার সাংকেতিক চিহ্ন হল ক্লীং। ব্যাহৃতি অনুসারে যদি ক্লীং বীজ ক্রমাগত উচ্চারণ করা যায় তাহলে যে তরঙ্গমালা উদ্ভূত হবে তা ঘনীভূত হয়ে কৃষ্ণমূর্তি সৃষ্টি করবে একথা বলেন সাধকেরা। কিন্তু তাতে লাভ কি?

যদি মনে করা যায় শ্রীকৃষ্ণ এই জগৎ সৃষ্টির মূলে রয়েছেন (কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ম্) তাহলে তাতে অনাদি শক্তিসম্পন্ন বললে অত্যুক্তি হবে না। অবশ্য কেউ বলবেন বিষ্ণু, কেউ বলবেন শিব জগৎ সৃষ্টির কর্তা। এতে আপত্তি করার কোন কারণ নেই। নির্গুণ ব্রহ্মকে সগুণ অবস্থায় যে কোন নামেই অভিহিত করা চলে। আমার বক্তব্য হল সৃষ্টির মূলে যিনিই থাকুন না কেন তিনি অমিত শক্তিসম্পন্ন। যদি তাঁর রূপ কল্পনা ক'রে সাধক বিশুদ্ধ শব্দ তরঙ্গের সৃষ্টি করতে পারেন তবে কোন সময়ে হয়তো তা বিশ্বশক্তির তরঙ্গের মূলছন্দের সঙ্গে একাত্ম হতে পারে। এই অবস্থাতে সেই বিশেষ রূপের প্রোজেকশন হওয়া সম্ভবপর।

মূলাধারে (অর্থাৎ সেক্রো-কক্সিজিয়াল নার্ভ প্লেক্সাস) কুণ্ডলিনী শক্তি সুপ্ত অবস্থায় আছে। তান্ত্রিক বর্ণনায় তাকে সর্পাকৃতির বলা হয়েছে। সাড়ে তিন পাকের কুণ্ডলী ক'রে রয়েছে। কুণ্ডলিনী জাগরিতা হলে সাপের ফণা উত্থিত হয়। সত্যিই কি বাস্তব সাপ আছে? তা নয়। এই প্রসঙ্গে আমরা পৌরাণিক কাহিনীতে প্রাপ্ত বাসুকির পৃথিবী ধ'রে রাখার কাহিনীটি স্মরণ করব। এটি নিঃসন্দেহে একটি রূপক। 'ব' মানে হল গচ্ছিত শক্তি বা পোটেনশিয়াল এনার্জি। 'কি' হল কার্যকরী

শক্তি বা কাইনেটিক এনার্জি। তার মধ্যে আছে 'অসু'। অসু হল 'প্রাণ' বা 'সেতু'। বাসুকির ফলা হল 'কি' অর্থাৎ কার্যকরী শক্তি। নাগরাজ বলা হল কেন? বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় নাগ = ন + অ + গ = অপ্রতিরুদ্ধগতি (আন-অবষ্টাকটেড মোশন, সেলফ-ইনিসিয়েটেড) = কাল। মূলাধারকে 'পৃথ্বী' তত্ত্বের সঙ্গে তুলনা করা হয়।

জপের বেলা নাদ এবং ভাব বাসুকির ফণা। পৃথিবীর বর্তমান তাপ, ব্যয় ও আয়ের ব্যালান্স ঠিক রেখে 'স্বচ্ছন্দে' রাখতে বাসুকির ফণাকে (average kinetic energy as heat) ভূগর্ভে এক নিয়ন্ত্রন 'যজ্ঞ' (রেডিয়াম বা অন্যান্য তেজক্রিয় মৌলের নিয়ন্ত্রর বিকিরণ বা এমানেশন ইত্যাদি) চালাতে হচ্ছে। মানুষের দেহ বা অন্য প্রাণিদেহ সম্বন্ধেও অনুরূপ ক্রিয়াকারকতা আছে। আমরা জানি এই পৃথিবী একটা বিরাট তড়িৎ-চৌম্বক যন্ত্রভাণ্ডার। তাই এর নিজস্ব তড়িৎ-চৌম্বকক্ষেত্র আছে তা বিশেষ 'লাইন অব ফোরস' দ্বারা সূচিত ও নিরূপিত। একারণে বিরাট শক্তিব্যূহকে যদি বাসুকির ফণা বলা যায় তাহলে বিদ্রূপ করার কিছু নেই। ম্যাক্সওয়েল যখন তাঁর বিখ্যাত 'Kinetic theory of Gases' এর ব্যাখ্যায় 'Sorting Demon'-এর উল্লেখ করেছিলেন তখন তাঁকে অবশ্যই বিদ্রূপ করা হয় নি।

সৃষ্টিতত্ত্ব আলোচনা করলে আমরা দেখতে পাই মূলে আছে দুটি তত্ত্ব। একটি হল শুদ্ধ চৈতন্য (বা শুদ্ধ চৈতন্য সত্তা) এবং অপরটি হল শক্তিরূপিণী চৈতন্যসত্তা। তন্ত্রে এদের বলা হয় শিব ও শক্তি। মানুষের দেহে বিশুদ্ধ চৈতন্য অর্থাৎ শিব গুরুমস্তিষ্কের সর্বোচ্চস্থানে অধিষ্ঠান করেন। তাকে বলা হয় সহস্রার। আর চৈতন্য-শক্তি বা প্রকৃতি-শক্তি অবস্থান করেন মূলাধারে। সাধারণ অবস্থাতে এই শক্তি সুপ্ত অবস্থায় থাকে। তবে তার গৌণ প্রকাশ ঘটে বায়ু, প্রাণ ইত্যাদির মাধ্যমে। প্রাণ শক্তি আর কুণ্ডলিনী শক্তি এক নয়। ইন্দ্রিয়সমূহের মূলভূমি হল প্রাণ। যতক্ষণ দেহের মধ্যে প্রাণ-শক্তি বিরাজ করে, ততক্ষণ পর্যন্ত ইন্দ্রিয়গুলি কার্যকরী থাকে। প্রাণ দেহ থেকে মুক্ত হলে ইন্দ্রিয়ের কর্মক্ষমতা থাকে না। সুষুপ্তির সময় ইন্দ্রিয়জ ক্ষমতা প্রাণশক্তির সমুদ্রে নিমজ্জ থাকে, আবার জাগ্রতে তার বিকাশ ঘটে। শাস্ত্রে এর প্রমাণ মেলে—'যদা বৈ পুরুষঃ স্বপিতি তর্হি বাজ্যোতি প্রাণং চক্ষুঃ, প্রাণং মনঃ প্রাণং শ্রোত্রং, স যদা প্রবুদ্ধ্যতে প্রাণদেবাহি পুণর্জায়ন্ত ইতি।' 'প্রাণ' ইন্দ্রিয়ের মূলভূমি হলেও তা প্রকৃতপক্ষে মাতৃকা শক্তির (বা ব্রহ্মণ্) এক বিশেষ বিকাশ মাত্র। 'ব্রহ্ম'কে একারণে বলা হয়েছে 'প্রাণস্য প্রাণঃ'।

যে মূল শক্তি মানবদেহ ও মনকে পরিচালনা করে তাকেই বলা হয় কুল-কুণ্ডলিনী। কল্পনা করা হয়েছে এই শক্তি কুণ্ডলী পাকিয়ে আছে। যখন শক্তি স্থির তখনই তা কুণ্ডলী। ঘড়ির স্প্রীং-এর কথা ভাবুন। দম দিলে স্প্রীং গুটিয়ে গোল হয়। যখন ঘড়ি চলতে শুরু করে তখন পাক খুলে যায়। কুল-কুণ্ডলিনী শক্তির অন্য নাম পরা-শক্তি। এর থেকেই মানুষের যাবতীয় বল ও ক্ষমতার প্রকাশ হয়। একে আবার শব্দ ব্রহ্মও বলা হয়, যেহেতু কুণ্ডলিনী শক্তি থেকেই যাবতীয় মন্ত্র উদ্ভূত হয়। তাই কুণ্ডলিনীকে অনেকে নাদ শক্তি বলেন।

সাধক আসনে স্থির হয়ে বসে দুটি ভ্রূর মাঝে মনঃসংযোগ করেন। বায়ু নাক দিয়ে গ্রহণ ক'রে ধরে রাখেন। ঊর্ধাঙ্গকে সংকুচিত করে প্রাণকে (ঊর্ধ বায়ু) নিশ্চল করেন। ফলে বায়ু উপর দিয়ে

না যেতে পারায় নিম্নগামী হয়। একে বলা হয় অপান বায়ু। এবারেও বায়ুর গতিকে রুদ্ধ করা হয় নিয়ন্ত্রকে সংকুচিত করে। ক্রিয়াটি ঠিক ভাবে করতে পারলে বায়ু মূলাধার কেন্দ্রের দিকে যায়। মূলাধার কেন্দ্রটি জননেন্দ্রিয় ও পায়ুদ্বারের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত। এখানে সুষুম্না নাড়ী (নাড়ী = স্নায়ু) এবং অন্যান্য নাড়ীসমূহের মূল কেন্দ্রভূত হয়েছে। সাধক মূলাধার চক্রের মধ্যে বায়ুকে আবদ্ধ করেন। তাঁর সমগ্র মন ও ইচ্ছাশক্তি ঐ স্থানেই নিবদ্ধ রাখেন। প্রাণ বায়ু ও অপান বায়ুর অণু পরমাণুর পারস্পরিক সংঘর্ষে তাপের সৃষ্টি হয়। এই তাপ মূলাধারে নিষ্ক্রিয় শক্তিকে (কুণ্ডলিনী শক্তি) উত্তেজিত করে। উপযুক্ত পরিবেশে এবং যথার্থভাবে ক্রিয়া করতে পারলে কুণ্ডলিনী শক্তি উত্থিত হয়। মনে করুন ইউরেনিয়ম ধাতুর কথা। প্রচুর শক্তি সম্পন্ন অথচ নিষ্ক্রিয়। অথবা তার পরমাণুর কথা কল্পনা করুন। তার মধ্যে তেজ আছে বলে মনে হবে না। অথচ তীব্রগতি সম্পন্ন 'নিউট্রন' কণা দিয়ে পরমাণুর কেন্দ্রে যদি আঘাত করা যায় তাহলে পরমাণু থেকে অমিত শক্তি নির্গত হবে। জড় বিজ্ঞানীরা এ পরীক্ষা ক'রে যেমনি নিশ্চিত সিদ্ধান্তে এসেছেন, তেমনি সাধকেরাও তাদের দেহরূপী ল্যাবরেটরীতে কুণ্ডলিনী-শক্তির জাগরণের প্রমাণ পেয়েছেন।

প্রশ্ন উঠবে কুণ্ডলিনী শক্তি ক্রিয়াশীল হলে কি লাভ? এর উত্তরে বলা যেতে পারে পরমাণুর ভিতর থেকে শক্তি নির্গত করেই বা কি লাভ? বিজ্ঞানীরা বলবেন পারমাণবিক শক্তিকে মানুষের কল্যাণে নিয়োগ করা যায়, মানুষ এর প্রভাবে ক্ষমতাবান হয়। কুণ্ডলিনী শক্তির বেলাতেও একই জবাব। পারমাণবিক শক্তিতে বলীয়ান মানুষ যেমন অপরের ক্ষতি করতে পারে (যা আমরা এই পৃথিবীতে অনবরত দেখছি) তেমনি কুণ্ডলিনী শক্তি জাগরণের ফলেও ক্ষমতাপ্রাপ্ত মানুষ অপরের ক্ষতি সাধন করতে সক্ষম। তবে উভয় ক্ষেত্রেই তারা ধিক্কারের পাত্র।

কুণ্ডলিনী শক্তি মূলাধার পরিত্যাগ ক'রে সুষুম্নার কাণ্ডের মুখে অবস্থিত ব্রহ্মদ্বার ভেদ করে চিত্রিনী নাড়ীর ভিতর দিয়ে ঊর্ধ্ব দিকে ধাবিত হয়। তারপরে বিভিন্ন চক্র, গ্রন্থি ইত্যাদি ভেদ করে সহস্রার অভিমুখে যায়। এ প্রসঙ্গে পরে আলোচনা করা যাবে।

সাধকেরা বলেন, কুণ্ডলিনী শক্তি বিভিন্ন চক্র অতিক্রম করে যাবার সময় বিভিন্ন দর্শন, নানারকম অনুভূতি হয় যা অস্বাভাবিক মনে হতে পারে। এ প্রসঙ্গে পদার্থ বিজ্ঞানের একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া চলে। প্রকৃতিতে সাধারণ ঘটনা যা দেখা যায় তা এক বিশেষ সীমার মধ্যে সংঘটিত হয়। যেমন ধরুন, ৩২° ফাঃ তাপকে এক সঙ্কট তাপমাত্রা বলা হয়, যেহেতু ঐ তাপমাত্রায় জল বরফে রূপান্তরিত হয়। আবার ২১২° ফাঃ তাপমাত্রায় জল বাষ্পে পরিণত হয়। তাহলে দেখা যাচ্ছে জল তার গুণ বা ধর্ম বজায় রাখতে পারে ৩২° ফাঃ থেকে ২১২° ফাঃ তাপের মধ্যে। প্রতিটি ভৌত ক্রিয়ার (ফিজিক্যাল অপারেশন) নির্দিষ্ট সীমা আছে। তার এদিকে বা ওদিকে গেলে রূপান্তর হয় বা দিক পরিবর্তন হয় অথবা নতুন জিনিসের উদ্ভব হয়। ঠিক তেমনি প্রাণ ও মনোজগতেও কতগুলি ফিজিক্যাল স্তর আছে। উত্তেজনা (স্টিমুলেশন) বাড়লে বিস্তৃততর অনুভূতি (অবশ্য একই ধরনের) হয় একটি নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত, তার ওদিকে গেলে হয় কোন অনুভূতি থাকে না অথবা স্বতন্ত্র ধরনের অনুভূতি হয়।

প্রকৃতির মধ্যে যে সব স্থায়ী বিশেষ আকৃতি (বা ফর্ম) দেখি তার প্রতিটির পেছনে রয়েছে নিয়ন্ত্রণের বিশেষ ব্যবস্থা (স্পেশাল প্রিন্সিপল অব কন্ট্রোল)। এই নিয়ন্ত্রণকারীর বিশেষ রূপ ও নাম

আছে আধ্যাত্মিক ইথিরীয় স্তরে। এই আধ্যাত্মিক ইথিরীয় স্তরের (বা স্পিরিচুয়াল ইথার) নিজস্ব কোন রূপ নেই, নাম নেই। বেদে নিয়ন্ত্রণকারী প্রতিটি সত্তাকে বলা হয় (চিৎ শক্তির রূপে) 'দেবতা'! এইভাবে, প্রতিটি বিশেষ ইন্দ্রিয়জ অনুভূতির বিশেষ দেবতা আছে। প্রতিটি দেবতার নির্দিষ্ট মন্ত্র আছে। সাধকেরা বলেন মন্ত্র (বীজময়) দেবতার রূপ সৃষ্টি করে। আর 'মন্ত্রের' সাহায্যে আমরা মন্ত্রের রূপায়ণস্বরূপ দেবতার আকৃতি চোখের সামনে দেখতে পাই। এই যন্ত্র রাহস্যিক (মিস্টিক)। যন্ত্রের বর্ণনা বর্তমান প্রবন্ধে আলোচনা করবার অবকাশ নেই।

বিশিষ্ট তন্ত্রসাধক সার জন উডরোফ বিভিন্ন তন্ত্রশাস্ত্র মন্থন করে কুণ্ডলিনী শক্তি সম্বন্ধে একটা নিজস্ব মত প্রকাশ করেছিলেন। তিনি বলেন মন্ত্রক্রিয়ার ফলে বা প্রাণায়ামের দ্বারা কুণ্ডলিনী শক্তি তার আধার পরিত্যাগ করে সহস্রারে মিলিত হয়। আবার সেখান থেকে নীচে তার নির্দিষ্ট স্থানে নেমে আসে। কিন্তু বিখ্যাত তন্ত্রবিদ আচার্য স্বামী প্রত্যাগাত্মানন্দ সরস্বতী স্বতন্ত্র কথা বলেছেন। তিনি বলেন, কুণ্ডলিনী শক্তি মূলাধারে যেমন আছে তেমনই থাকে। ক্রিয়ার ফলে তার থেকে তেজ প্রবাহ নির্গত হয়, যেমনটি তেজক্রিয় পরমাণুর বেলাতে হয়ে থাকে। অর্থাৎ রেডিও-অ্যাকটিভ এমানেশনের সঙ্গে তিনি এই প্রক্রিয়ার তুলনা করেছেন।

চুম্বকের যেমন দুটি মেরু আছে, তেমনি দেহেরও দুটি মেরু বর্তমান। দেহকে তড়িৎ-চুম্বকের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। মূলাধার হলো দেহের স্থিতিশীল মেরু। বাকী অংশ হলো গতিশীল। স্থিতিশীল বলেই এখানে স্থিতি শক্তির (পোটেনশিয়াল এনার্জি) মূল আশ্রয়ভূমি। একারণে মূলাধারকে 'পৃথিবী'র সঙ্গে তুলনা করেছেন শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতেরা। এটি হলো পঞ্চভূতের সর্বনিম্ন 'ভূত'। এখান থেকেই শক্তি গতিপ্রাপ্ত হয়। বিকশিত হয়ে ঊর্ধ্বগ হয়।

মূলাধারে অসীম শক্তি নিহিত থাকে। সুপ্ত শক্তি কখনো নিঃশেষিত হয় না। নিঃশেষিত হলে দেহপাত হয়। কুণ্ডলিনীর স্থিতিশক্তি যদি অসীম গতি শক্তিতে পরিণত হয় অর্থাৎ মূলাধারের কুণ্ডলীকৃত শক্তির সব 'পাক' যদি খুলে যায় তাহলে স্থূল, লিঙ্গ এবং কারণ দেহের 'লয়' হয়। এই অবস্থাকে বলা হয় বিদেহ মুক্তি। কিন্তু 'মহা-কুণ্ডলী' তখনও বর্তমান থাকে। ক্রিয়ার ফলে কুণ্ডলিনী শক্তি থেকে তার সত্তার আংশিক বিচ্ছুরণ হয়। বিচ্ছুরিত শক্তি বিভিন্ন চক্র অতিক্রম করে সপ্তম চক্র বা সর্বোচ্চ চক্রে (সহস্রার) শিবের মহাকুণ্ডলীতে গিয়ে বিমিশ্র হয়। কিন্তু যে ঘনীভূত শক্তি মূলাধারে সদা বিরাজমান, সেই শক্তি ঐ স্থান থেকে সমূলে উৎপাটিত হয় না। শ্রীনগর (কাশ্মীর) অধিবাসী বিখ্যাত যোগী গোপীকৃষ্ণ কুণ্ডলিনী শক্তি সম্বন্ধে বলেছেন, 'the phenomenon of kundalini is entirely biological in nature'। কুণ্ডলিনী জাগরণের ফলে আমাদের সমগ্র স্নায়ুতন্ত্রে একটা বিস্ময়কর পরিবর্তন দেখা দেয়। হঠযোগ বা রাজযোগ পদ্ধতিতে অথবা অন্য কোন প্রক্রিয়ায় কুণ্ডলিনী শক্তির জাগরণ হলে সাধকের দেহের স্বাভাবিক যন্ত্রে আকস্মিকভাবে প্রচণ্ড পরিবর্তন লক্ষিত হয়। এই পরিবর্তনের জোয়ার এত বিরাট যে সাধক তা নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন না। তখন তাঁর দেহ একটি ছোট ল্যাবরেটরীতে পরিণত হয়। দেহের সর্বত্র যে অসংখ্য স্নায়ু ছড়িয়ে রয়েছে যাদের অস্তিত্ব কোনদিন সাধারণ চেতনার সাহায্যে অনুভব করা সম্ভব হয় নি, কুণ্ডলিনী শক্তির প্রভাবে সেইসব স্নায়ু নতুন ধরনের কাজ করতে শুরু করে। অজ্ঞাত স্নায়ু সমূহের কর্মধারা সাধক কখনো

মুহূর্তেই উপলব্ধি করতে পারেন আবার কখনো ধীরে ধীরে তাঁর চেতনায় আসে।

অসংখ্য কর্মহীন স্নায়ু যখন অদৃশ্য শক্তির প্রভাবে ক্ষমতাবান হয় তখন তাদের অগণিত স্নায়ুমূল (নার্ভ-এণ্ডিং) থেকে আশে পাশে তন্তুর উপরে সুধা বা সুগন্ধি ও সুমিষ্ট নির্যাস ক্ষরিত হয়। এই নির্যাস দুটি পথ বয়ে চলে। নির্যাসের কিছু অংশ থেকে বিকিরণ আরম্ভ হয় এবং বিকিরিত প্রবাহ ঊর্ধ্বগামী হয়। বাকী অংশ সুষুম্নাকাণ্ডের মধ্যে দিয়ে প্রজনন কেন্দ্রকে প্লাবিত করে দেয়। ফলে জনন কেন্দ্র অস্বাভাবিক ক্রিয়াশীল হয়ে পড়ে। সমগ্র স্নায়ুমণ্ডলীর সঙ্গে একতালে চলার জন্যে সে চেষ্টিত হয়। আর যে অংশ বিকিরিত হয়, তা স্বয়ংপ্রভ মেঘ রূপে মস্তিষ্কে পৌঁছায়, মণ্ডিত করে তোলে মস্তিষ্কের কোষসমূহকে। ফলে দেহের উত্তেজিত মূল অঙ্গ সমূহ—বিশেষভাবে পাকযন্ত্রসমূহ যাতে নতুন ব্যবস্থাকে দেহ গ্রহণ করে নিতে পারে, তার ব্যবস্থা হয়। কুণ্ডলিনীর জাগরণ সূচিত করে মানুষের নতুন জন্ম। ব্যক্তি চেতনার সঙ্গে বিশ্ব চেতনার যোগাযোগ স্থাপিত হয়। দেহ তখন নতুন সিগন্যাল, নতুন নির্দেশনা মেনে চলে।

প্রাণায়াম বা মন্ত্র জপ-যে কোন পন্থাতেই কুণ্ডলিনী সক্রিয় হলে শক্তিশালী শুক্র (শাস্ত্রে যাকে বিন্দু বলা হয়) মেরুরজ্জু দিয়ে অভিকর্ষকে উপেক্ষা করে ঊর্ধ্বমুখী হয় সুষুম্নার যাবতীয় স্নায়ুকে সিক্ত করে মস্তিষ্কে উপনীত হয়। সমগ্র স্নায়ুমণ্ডলী সতেজ হয়। পুষ্টিলাভ করে। ফলে যে সব স্নায়ু আপাত দৃষ্টিতে ক্রিয়াহীন বলে মনে হতো তার কর্মকাণ্ড অনুভব করতে পারি।

এই বক্তব্য পড়ে অনেকে বলতে পারেন ফ্রয়েডও তো একই রকম কথা বলেছেন। তিনি লিবিডোর প্রসঙ্গে যা বলেছেন এখানে তা স্মরণযোগ্য। গোপীকৃষ্ণের বক্তব্যের সঙ্গে ফ্রয়েডের তফাৎ অনেক। বিখ্যাত বিজ্ঞানী Carl Friedrich Freiherr Von Weizacker (Director of the Max-Phanck-Institute for the Life Sciences, Munich Germany) বলেন, 'For Gopikrishna evolution is essentially determined by its goal. For him sexual Potency is the 'nourishment' of a higher structure. Freud, on the other hand, represents a form of psychological reductionism'।

সাবরণতিলকে বলা হয়েছে, কুণ্ডলিনী শক্তি বিদ্যুল্লতার মতো। কুণ্ডলিনী যখন সুপ্ত, ক্রিয়াহীন, মানুষ তখন সাধারণ জ্ঞান ও শক্তির সাহায্যে কাজ করে। আর শক্তির বিকাশ হলে নতুন শক্তি ও বল আবির্ভূত হয়। শক্তি ঊর্ধ্বগামী হলে আমাদের সত্তার সব স্তর বিকশিত হয়। বিশ্বপ্রাণ বা বিশ্ব চৈতন্যের সঙ্গে সাধকের সংযোগ ঘটে। তাই কুণ্ডলিনীর ক্রিয়াতে জ্ঞানের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম জগৎ উদ্ভাসিত হয় তা স্বাভাবিক বুদ্ধি ও জ্ঞানের অগোচর। তন্ত্রসাধনায় বিকৃতির বিকাশ অবশ্যম্ভাবী যেহেতু সত্তার প্রতিটি স্তরে নতুন শক্তির জাগরণ ঘটে। তাকে বলা যেতে পারে দিব্য শক্তি। যদি কেউ মনে করেন কুণ্ডলিনী যোগ তন্ত্রের বিশেষ পন্থা মাত্র তাহলে ভুল হবে। অধ্যাত্মমার্গের প্রতিটি ক্ষেত্রে বিশেষ প্রক্রিয়ায় কুণ্ডলিনী শক্তি ক্রিয়াশীল হয়। এমনকি জ্ঞানের প্রশান্তিতে; সর্বজীবে, সর্বভূতে প্রেমের বন্যায়, ধ্যানের নিস্তরঙ্গভূমিতে নিজেকে পরিপূর্ণভাবে নিমজ্জিত করতে পারলে কুণ্ডলিনী শক্তি আমাদের অজ্ঞাতসারেই জাগরিত হয়। তার প্রভাব আমরা অবশ্যই প্রত্যক্ষ করতে পারি।

তথ্যপঞ্জী

১। Kundalini Yoga—M. P. Pandit

২। The Serpent Power—Sir John Woodroffe

৩। জপসূত্রম (৩য়)—স্বামী প্রত্যগাত্মানন্দ সরস্বতী

৪। Nature and its value— ঐ

৫। তন্ত্রের আলো—ডঃ মহেন্দ্রনাথ সরকার

৬। The biological basis of religion and genius—Gopi Krishna

৭। Kundalini—Gopi Krishna

৮। স্বামী প্রত্যগাত্মানন্দ সরস্বতীর দৃষ্টিতে কুণ্ডলিনী তত্ত্ব—ডঃ অমিয়কুমার মজুমদার

৯। তন্ত্রতত্ত্ব—শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব

১০। ষটচক্রনিরূপণম্ এবং পাদুকাপঞ্চকম্

বনদুর্গা

হারাধন দত্ত

হিন্দু দেবদেবীর সংখ্যা অগণিত। বেদ-পুরাণ-তন্ত্রের নানাস্থানে এইসব দেবদেবীর বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। বহু দেবদেবীর কথা শাস্ত্রগ্রন্থে পাওয়া যায় না। লোকমুখে জনশ্রুতির ধারায় অনেক দেবদেবীর কথা প্রাচীনকাল থেকে বিক্ষিপ্তভাবে বিভিন্ন জনসমাজে প্রচলিত রয়েছে। গ্রামবাঙলায় সাধারণ লোকের মধ্যে এমন অনেক দেবতার পূজা প্রচলিত আছে যাদের কথা কোন প্রসিদ্ধ গ্রন্থে স্থান পায় নি। পুরোহিতদের হাতে লেখা পুথিতে যা পৌরোহিত্য বিষয়ক অধ্যাত পুস্তকে এইসব দেবদেবীর পরিচয় পাওয়া যায়। লৌকিক দেবদেবীর আকৃতি-প্রকৃতি ও পূজাপদ্ধতি বৈচিত্র্যপূর্ণ। মূর্তিতে এইসব দেবদেবী সর্বত্র পূজিত নন। ব্রাহ্মণ্য রীতিও সর্বক্ষেত্রে অনুসৃত হয় না। পূজা অনেক ক্ষেত্রে বাড়ীর বাইরে এমনকি গ্রাম থেকে কোন দূরবর্তী স্থানে অনুষ্ঠিত হয়। এইসব দেবদেবীর পূজা ও আনুষ্ঠানিক উৎসব ক্রমশঃ অবলুপ্তির পথে। ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্রে উল্লিখিত না হ'লেও এই সমস্ত দেবতাদের সকলেই অর্বাচীন নন। ইতিহাস পূর্বযুগের অনেক দেবতা পরবর্তীকালে ব্রাহ্মণ্য সমাজে স্থান করে নিলেও সকলেই শাস্ত্রমধ্যে প্রবেশাধিকার পান নি। এই সূত্রে বৃক্ষদেবী বনদুর্গার কথা আলোচনার যোগ্য।

দুর্গা হিন্দুর শাস্ত্রোক্ত দেবী। মহাকাব্য ও শাক্তপুরাণে দুর্গার মাহাত্ম্য বর্ণিত আছে। কালক্রমে 'দুর্গা' নামের আড়ালে অনেক লৌকিক দেবী শাস্ত্রীয় মর্যাদা লাভ করলেও বনদুর্গা পৌরাণিক মহিমা থেকে বঞ্চিত আছেন। শাস্ত্রগ্রন্থেও লৌকিক দেবতার অস্তিত্ব স্বীকার করা হয়েছে। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণের প্রকৃতি খণ্ডে, গ্রামদেবতার উল্লেখ আছে। বাঙলাদেশের বিভিন্ন জনপদে 'বনদুর্গা' পূজার প্রচলন আছে। পূজা সর্বত্র একই রীতিতে অনুষ্ঠিত হয় না। তবে কয়েকটি ক্ষেত্রে সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। বনদুর্গা বৃক্ষদেবী, শেওড়া গাছে তার অধিষ্ঠান। বনদুর্গা শিশুকল্যাণ ও শিশুরক্ষার দেবী।

আদিকাল থেকে ভীরু, আত্মপ্রত্যয়হীন, প্রকৃতির রহস্য উদ্ঘাটনে অসমর্থ, প্রকৃতির বৈচিত্র্যে বিমূঢ় মানুষ জীবনের প্রতি পদক্ষেপে অলৌকিক শক্তির কাছে নতি স্বীকার করেছে। বিপদ-আপদ থেকে আত্মত্রাণের জন্য নানা দেবদেবীর কল্পনা করেছে। কুহেলি অরণ্য-বনভূমি মানুষের কাছে পরম বিস্ময়। এই বিস্ময় থেকে আদিম মানুষের সমাজে বৃক্ষ পূজার সৃচনা। বৃক্ষপূজা প্রাগৈতিহাসিক যুগের। অশ্বত্থ, বেল, নিম, তুলসী, তেঁতুল, বাঁশ প্রভৃতি বৃক্ষ দেবতা ও অপদেবতার আবাসস্থলরূপে চিহ্নিত।

বনদুর্গার স্থান শেওড়া গাছ। শেওড়া সুদৃশ্য ও নয়নাভিরাম বৃক্ষ নয়। শেওড়া গাছ কুৎসিত, কদর্য, রুক্ষ ও খাটো। এই গাছে প্রেত-প্রেতিনী প্রভৃতি অপদেবতা বসবাস করে বলে লোকের ধারণা। বৃক্ষদেবতা ও ভৌতিক অপদেবতার তুষ্টি সাধন এই দুইয়ের মিলনে মিশ্রদেবী বনদুর্গার পরিকল্পনা। বৃক্ষের সঙ্গে ভূত-প্রেত প্রভৃতি অশুভ শক্তির কল্পনা প্রাচীন যুগের। সুপ্রাচীন সিন্ধু উপত্যকার সভ্যতা নিদর্শন সমূহের মধ্যে এমন অনেক উপকরণ আবিষ্কৃত হয়েছে যা থেকে বৃক্ষাধিষ্ঠিত শক্তিতে মানুষের বিশ্বাসের দিকটি স্ফুরিত। মার্শাল তাঁর 'Mahenjo-Daro and the Indus Civilisation', Vol. I গ্রন্থে চিত্র সহযোগে এ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন।

পশ্চিমবঙ্গ, আসাম ও বাঙলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ভিন্ন ভিন্ন নামে বনদুর্গা পূজিত হয়। হাণ্টার 'Statistical Account of Bengal' Vol. VII গ্রন্থে বুড়ী পূজার পরিচয় লিপিবদ্ধ করেছেন। বগুড়া জেলার হিন্দু কোচদের মধ্যে 'বুড়ীপূজা' প্রচলিত আছে। এই পূজা উপলক্ষে কোচেরা শেওড়া গাছে দুধ, চিনি প্রভৃতি উৎসর্গ করে। মুসলমানেরাও এই পূজায় অংশগ্রহণ করে। পাবনা জেলার 'অলাপ' গ্রামে বুড়ীপূজার অনুষ্ঠান হয়। দুর্গাপূজার সময় গ্রামের মেয়েরা নিকটবর্তী একটি বনে শেওড়া গাছে পূজা দেয়। এই পূজায় ব্রাহ্মণ পুরোহিত আসেন—ব্রাহ্মণ মহিলারা থাণ্ডাদি রন্ধন করে পূজায় অর্ঘ্য নিবেদন করে। মাছ-মাংস পূজার উপকরণ রূপে গ্রাহ্য। পূজার উদ্দেশ্য পরিবারের মেয়েদের এবং শিশুপুত্রকন্যার কল্যাণ। পশ্চিমদিনাজপুরের গঙ্গারামপুর থানার দেবীপুর ও বংশীহারী থানার 'বাগদুয়ার' গ্রামে বুড়ীমার পূজা ও মেলা উৎসব হয়। চব্বিশ পরগণার সোনারপুর থানার রাজপুর ও বারাসত থানার দাসপুরে বুড়োমা বা বুড়ীমার মেলা প্রচলিত আছে। বলাবাহুল্য পূর্বোল্লিখিত বুড়ীর পূজার সঙ্গে এদের পূজাপদ্ধতির সাদৃশ্য আছে কিনা জানা নেই।

ময়মনসিং জেলায় বনদুর্গার অপর নাম রূপসী বা রূপেশ্বরী। আসামের সিলেট অঞ্চলেও রূপসী বা রূপেশ্বরীর পূজা অনুষ্ঠিত হয়। এই দেবীও শেওড়া গাছের অধিষ্ঠাত্রীরূপে পূজিত। গ্রাম থেকে দূরবর্তী কোন নির্জন স্থানে শেওড়ার ডাল প্রথিত করে অথবা গ্রাম সন্নিহিত অদূরবর্তী বনে শেওড়াগাছের মূলে হাঁসের ডিম, হরিদ্রাভ বস্ত্রখণ্ড, সিন্দুর প্রভৃতি পূজা অর্ঘ্য নিবেদিত হয়। বাদ্যসহ সঙ্গীত পরিবেশিত হয়। শিশুত্রাণ ও নারীজীবনের মঙ্গলকামনা পূজার উদ্দেশ্য। ঢাকা জেলার কোন কোন অঞ্চলে নির্দিষ্ট বৃক্ষ চণ্ডীগাছ বা কালীগাছ নামে অভিহিত। হিন্দুদের কাছে এ গাছ খুব পবিত্র। সেইজন্য এ গাছ কাটাও নিষিদ্ধ। গ্রামের মেয়েরা বিশেষ করে বিবাহিত মহিলারা এই গাছ পূজা করে। ঢাকা জেলার ষোলঘর অঞ্চলে এইরকম বৃক্ষপূজা চলে আসছে। এই বৃক্ষ পূজার সঙ্গে রূপসী বা রূপেশ্বরীপূজার বহুলাংশে সাদৃশ্য আছে।

কুচবিহার জেলার মাথাভাঙ্গা ও মেখলিগঞ্জ থানার পাটছাড় গোয়ালপুর ও জামালদহ গ্রামে ভাণ্ডালী ও ভাণ্ডারনীর পূজা ও মেলা হয়। ভাণ্ডারনী দেবী দ্বিভুজা ব্যঘ্রবাহিনী। বর্তমানে একটি টিনের ঘরে দেবী অবস্থান করেন। সাধারণতঃ দুধ, মিষ্টি, পাঁঠা ও কবুতর দেবীর চরণে মানত দেওয়া হয়। পুত্রকন্যার মঙ্গলের জন্য দেবীর কাছে অনেকে মানত করেন। শারদীয়া দুর্গাপূজার পর ভাণ্ডারনীর পূজা হয়। ভাণ্ডরনী দেবী সম্পর্কে নানা কাহিনী ও জনশ্রুতি প্রচলিত আছে। জলপাইগুড়ি জেলার ময়নাগুড়ি থানার পদমতী, ধূপগুড়ি থানার ভাণ্ডানী, আলিপুর দুয়ারের যোগেন্দ্রনগর এবং কুমারগ্রাম থানার নাথরণী গ্রামে আড়ম্বরের সঙ্গে 'ভাণ্ডালী'র পূজা ও মেলা উৎসব হয়। উত্তরবঙ্গের বিস্তৃত অঞ্চলে ভাণ্ডালীর অপর নাম 'বনদুর্গা'। ভাণ্ডালী ও ভাণ্ডারনী মূলতঃ একই দেবী। এই দুই জেলার প্রায় প্রতি গ্রামে ভাণ্ডালী বা বনদুর্গার পূজা প্রচলিত আছে। উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়ি ও কুচবিহারের অরণ্যসঙ্কুল অঞ্চলের আদিবাসী সমাজের উপাস্যদেবী ভাণ্ডালী। এই দেবী এখন গ্রামের চালাঘরে বা গৃহপ্রাঙ্গনে স্থান করে নিয়েছেন। দেবী অধিকাংশ ক্ষেত্রে ব্যঘ্রপরি আসীন। কোথাও বা সিংহবাহিনী। দেবী কোথাও চতুর্ভুজা, কোথাও দ্বিভুজা। এই পূজাও শারদীয়া পূজার পরে অনুষ্ঠিত হয়। পূজায় সর্বত্র ব্রাহ্মণ পুরোহিতের প্রয়োজন হয় না।

পায়রা, পাঁঠা, মহিষ প্রভৃতি বলি দেওয়া হয়। সাম্প্রতিককালে ভাণ্ডালী দেবী কোথাও কোথাও পৌরাণিক দুর্গার অনুরূপ প্রতিমায় পূজিত হন। আরও লক্ষণীয় ভাণ্ডালী ক্রমশঃ অরণ্য থেকে লোকালয়ে প্রবেশ করেছেন।

পশ্চিমবঙ্গের বীরভূম বাঁকুড়া জেলার অরণ্যসঙ্কুল জনপদে বনদুর্গা এখনও প্রাচীন মহিমায় বিরাজিত। এই সূত্রে বীরভূম জেলার ত্রিদণ্ডীশ্বর অঞ্চলে বনদুর্গার ভিন্ননাম গুড়ি ঠাকুরাণী (Goddes of the tree trunk)। গুড়ি ঠাকুরাণীর পূজা হয় শেওড়া তলায়। মহিলারাই এ পূজার উদ্যোক্তা। পূজা উপলক্ষ্যে বনভোজন হয়। হাস, মুরগী ও কবুতরের ভিন্ন পূজায় মানত দেওয়া হয়। জন্ম থেকে বিবাহকাল পর্যন্ত পুত্র-কন্যাদের মঙ্গল কামনা করা হয়। এই অঞ্চলের আর্ রায় ইচ্ছাই ঘোষের দিঘি ও দিঘি সংলগ্ন একটি ভগ্ন মন্দির এখনও বর্তমান। মধ্যযুগে রচিত ধর্মমঙ্গল কাব্যকাহিনীগুলিতে ইছাই ঘোষ অন্যতম বীর নায়করূপে চিত্রিত। তিনি অজয় তীরবর্তী চেকুরের রাজা ছিলেন। তাঁহার শক্তি উপাসনার কথা বহু বিদিত। হাণ্টার তাঁর Annals of Rural Bengal, এ ইছাই ঘোষের কাহিনী লিপিবদ্ধ করেছেন। উপরি উক্ত ভগ্ন মন্দিরের পাশে একটি মাটির ঘরে বনদুর্গা প্রতিষ্ঠিত আছেন। এখানে দেবী-প্রতিমায় বিরাজিত। মূর্তিটি দশভুজা দুর্গার অনুরূপ। হিন্দু ভাবাপন্ন আদিবাসীরা এই দেবীর পূজা করেন। ধ্যানমন্ত্রে দেবী করালদ্রংষ্টা, ত্রিনেত্রা, ভীষণাকৃতি, শঙ্খশোভিতা শেওড়া অধিষ্ঠাত্রীরূপে মূর্তিমান। মন্দিরের নিকটে শেওড়া বন। আদিবাসী মেয়েরা এই বনে শেওড়া মূলে পূজা-উপচার নিবেদন করে। গাছের গুড়ি ঠাকুরাণীকে পূজা-অর্ঘ্য নিবেদন কালে মেয়েরা লোকভাষায় মন্ত্র উচ্চারণ করে। পূজারিণীদের একান্ত কামনা পুত্ররক্ষা, পুত্রদান ও জমিতে শস্যসম্ভার। পূর্ব বাঙলার কুমিল্লায় কামিনী বৃক্ষের তলে বনদুর্গা পূজিত হন। বীরভূমের অন্যান্য অঞ্চলে শাল-পলাশ, বাঁকুড়ায় পলাশ এবং মানভূমে অশ্বত্থ বৃক্ষের তলে বনদুর্গা পূজা দেখা যায়। কোন কোন অঞ্চলে কুলগাছের নিচেও বনদুর্গার অর্চনা হয়।

উপরিউক্ত বিবরণে পশ্চিমবঙ্গ, বাঙলাদেশ, আসাম ও বিহারের বিভিন্ন অঞ্চলে ভিন্ন ভিন্ন নামে বনদুর্গা পূজার বিবরণ উপস্থিত করা গেল। বুড়ী, বুড়ীমা, বুড়োমা, রূপসী বা রূপেশ্বরী, ভাণ্ডারনী, ভাণ্ডালী, গুড়ি ঠাকুরাণী প্রভৃতি দেবী বনদুর্গার নামান্তর। পূর্বোক্ত বিবরণ থেকে অনুমান করা যায়; (১) বনদুর্গা মূলতঃ বৃক্ষদেবী—এই দেবীর অধিষ্ঠান শেওড়া গাছ। (২) প্রায় সর্বত্র এই পূজার উদ্দেশ্য শিশুরক্ষা ও শিশুমঙ্গল। (৩) পূজাপদ্ধতি সাধারণতঃ অশাস্ত্রীয়। (৪) মহিলারাই বনদুর্গার পূজা করেন। খ. Crook ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে 'The Popular Religion and Folklore of Northern India' নামক দু'খণ্ড গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে বনদুর্গাকে local Godlings বলা হয়েছে। গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে 'Tree and Serpent Worship' অধ্যায়ে লেখক উত্তর ভারতের প্রচলিত বৃক্ষপূজার বিস্তৃত বিবরণ দিয়াছেন। কিন্তু শেওড়া গাছের কোন উল্লেখ নেই। বস্তুতঃ বৃক্ষপূজার ক্ষেত্রে শেওড়া কোন গণনীয় বৃক্ষ নয়। ইতিপূর্বে আলোচনাস্থলে শেওড়াকে অশুভ প্রেতিনীর আশ্রয়স্থল বলে উল্লেখ করেছি। শেওড়ার সঙ্গে এই ভৌতিক সম্পর্ক আদিবাসী সমাজের ভৌতিক ধারণা থেকে উদ্ভূত বলে মনে হয়। কারণ পবিত্র ধর্মসাহিত্যে শেওড়া গাছ—বেল, অশ্বত্থ, নিম প্রভৃতি বৃক্ষের মত উচ্চাসনে আসীন নয়। শেওড়া বৃক্ষাধিষ্ঠাত্রী এই দেবীর পূজা জঙ্গলে বা লোকালয় থেকে

দূরবর্তী বা নির্জন স্থানে অনুষ্ঠিত হয়। এই সূত্রে শাস্ত্রোক্ত ভয়ঙ্কর দেবতা 'রুদ্রের' কথা স্মরণ করা যেতে পারে। এঁদের অশুভ প্রভাব যাতে লোকালয়ে প্রবেশ না করে সেজন্যই গ্রামের বাইরে পূজানুষ্ঠানের ব্যবস্থা। কিন্তু কালক্রমে বনদুর্গা লোকালয়ে প্রবেশ করেছে এবং পূজাপদ্ধতির প্রাচীন খোলস ছেড়ে পরিবর্তন খুঁজেছে।

স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে ভৌতিক সম্পর্কযুক্ত শেওড়া গাছ কি ক'রে মহিলা সমাজের আরাধ্য হ'ল? এই গাছ মঙ্গলের প্রতীকরূপেই বা কেন গ্রাহ্য? বীরভূমের ত্রিদণ্ডীশ্বর অঞ্চলে বনদুর্গার প্রতিমাপূজার যে রক্ষণশীল পূজানুষ্ঠানের উল্লেখ করেছি সেখানে এই দেবী-ভীষণা, বিরূপাকৃতি, উগ্রদ্রংষ্টা। অন্যত্র বনদুর্গাকে ষাদশ দানব ভ্রাতার মাতা বলা হয়। এদিক থেকে নিস্তারিনী বনদুর্গার সঙ্গে আলোচ্য বনদুর্গার সাদৃশ্য প্রত্যক্ষ করা যায়। 'ক্রিয়াকান্ত বারিধি' (বঙ্গমতী সং) গ্রন্থে দেবীর ধ্যানে এই সাদৃশ্যের আভাস মেলে। নিস্তারিণী বনদুর্গা ও ষাদশ ভ্রাতার সঙ্গে পূজিতা। ষাদশ দানবের সঙ্গে এই সম্পর্ক থেকে মনে হয় এই দেবী দানবমাতা। এই প্রসঙ্গে স্বভাবতই শিশুহারিণী জাতাপহারিণীর প্রসঙ্গ মনে আসে। এই দেবীর পূজা বাড়ীর বহির্দেশে অনুষ্ঠিত হয়। ইনি উর্ধকেশা, উগ্রদ্রংষ্টা, ত্রিনেত্রা, উগ্রনয়না ভীষণা, বিরূপাকৃতি শিশুহারিণী। বীরভূম জেলার উল্লিখিত পূজায় মহিলাগণ শিশুনিরাপত্তার জন্য বনদুর্গার যে প্রতিমায় পূজা দান করেন তা দানবী নিস্তারিণী বনদুর্গার ন্যায়। এই দানবমাতা বনদুর্গার ভয়ঙ্কর মূর্তি নিঃসন্দেহে শিশুহারিণী জাতাপহারিণীর অনুরূপ। এরা হারিতা, জরা, যক্ষিণী, কুণ্ডলা প্রভৃতির উত্তরসূরী। লক্ষ্য করার বিষয় এই সমস্ত শিশুহননকারী দানবী কালক্রমে শিশুত্রাণকর্ত্রীরূপে পূজিত হয়েছেন। মহাভারতের বনপর্বে রাক্ষসী জরা, পূতনা, বিনতা, দিতি, অদিতি, কদ্রু, প্রভৃতি শিশুহননকারিণী দানবীগণ দেবীত্ব লাভ করেছেন। শেওড়া গাছের অশুভ প্রেতিনী ঠিক একই পন্থায় দেবীত্বে উন্নীত হয়েছেন।

প্রসঙ্গতঃ বনদুর্গার সঙ্গে ষষ্ঠী ও অরণ্যষষ্ঠীর সম্পর্কের দিকটিও বিবেচ্য। শিশুহারিণী নিস্তারিণী বনদুর্গা এবং বনদুর্গা শিশুরক্ষয়িত্রীরূপে পূজিত হলেও ষষ্ঠী পৃথক দেবতা। ভীতি প্রদায়িনী দানবী কালক্রমে শিশুরক্ষয়িত্রীমাত্র-ষষ্ঠী সন্তান-সন্ততির শুভজন্মের দেবী। ষষ্ঠীর বনদুর্গার মত মেয়েলি পূজা। অরণ্য ষষ্ঠী উভয় বাঙলায় বহুল প্রচলিত। যে ধর্মানুষ্ঠানের সঙ্গে জামাইষষ্ঠীকে যুক্ত করা হয়ে থাকে তার নাম অরণ্য ষষ্ঠীব্রত। জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লপক্ষের ষষ্ঠীতে প্রায় প্রতি ঘরে এই উৎসবের সাড়া পড়ে যায়। ইহা লোকাচার ও মেয়েলি ব্রত। পরিচিত প্রাচীন গ্রন্থে অরণ্যষষ্ঠীর কোন প্রসঙ্গ নেই। বর্তমানে বাণপূজার প্রচলন নেই। অরণ্য ষষ্ঠী পূর্বে অরণ্যেই অনুষ্ঠিত হত। অরণ্য ষষ্ঠী পৌরাণিক ষষ্ঠীদেবীর লৌকিক রূপ। সন্তান-সন্ততির মঙ্গলের জন্য এই ষষ্ঠীর আরাধনা করা হয়। বিভিন্ন রূপে বনদুর্গার পূজানুষ্ঠানের যেসব বিবরণ পাওয়া গেছে তা নিঃসন্দেহে প্রমাণ করে অরণ্যষষ্ঠী ও বনদুর্গা এক দেবী নন। তবে অরণ্যষষ্ঠীর সঙ্গে সাদৃশ্যের দিক হচ্ছে—এই পূজা বনদুর্গার মত মেয়েলি পূজা। অরণ্যষষ্ঠী ব্রতের উদ্দেশ্য সন্তান-সন্ততির মঙ্গল বনদুর্গার মত অরণ্যষষ্ঠী পূর্বে নির্জন স্থান বা বনমধ্যে পূজিত হতেন।

শরৎচন্দ্র মিত্র 'Man in India' (১৯২২, পৃ. ২২৮) পত্রিকায় শেওড়াগাছের অধিষ্ঠাত্রীদেবী বনদুর্গার পরিচয় লিপিবদ্ধ করেছেন। আসলে বনদুর্গা প্রথমে ছিলেন শেওড়াগাছে পরে পদোন্নতি বা লোকসমাদৃত হয়ে এলেন জঙ্গলে বা নির্জন স্থানে আরও পরে লোকালয়ে প্রবেশ করে প্রতিমায় পূজিত

হয়েছেন। এই বনদুর্গা বিন্ধ্যবাসিনী শিবপ্রিয়ারূপে কল্পিত। শেওড়া গাছের অধিষ্ঠাত্রী দেবী এমনি করে শাস্ত্রীয় মর্যাদায় উন্নীত হয়েছেন। গোপীনাথ রাও তাঁর মূর্তিতত্ত্ববিষয়ক গ্রন্থে অর্ধভুজা এক বনদুর্গার পরিচয় দিয়েছেন।

বৌদ্ধ দেবদেবীতত্ত্ব ও মহাভারতীয় উপাখ্যানে শিশুহারিণী ও শিশুভয় দাত্রী দানবীরা শিশু রক্ষয়িত্রী দেবীরূপে পূজিত হয়েছেন বৃক্ষবাসিনী এইসব দৈত্য দানবীয় ধারণা বনদুর্গায় অনুপস্থিত। কিন্তু শেওড়াগাছ অমূর্ত অপদেবতার আবাস—এই ধারণাও বোধকরি পূর্বভারতীয় আদিবাসী সমাজের এই অশুভ ভৌতিকবোধ মনে হয় বৃক্ষাধিষ্ঠিত রাক্ষসী বা দানবীর স্থান পূরণ করেছে। কারণ শেওড়া এই ধরণের দানবীয় ভাবনামুক্ত। মহাকাব্যের এই ঐতিহ্য বাদ দিলেও আর একটি বিষয়ে দৃকপাত করা যেতে পারে। প্রাচীন যুগ থেকে বৃক্ষপূজার মূলে ছিল বোধহয় বৃক্ষের উৎপাদনশীল বা বর্ধনশীল শক্তি মানুষ এই শক্তিকে প্রজনন শক্তি রূপে প্রত্যক্ষ করেছে। প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে বৃক্ষের বর্ধন বা উৎপাদিকাশক্তি মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সমর্থ হয়েছে। এজন্যই এদেশের হিন্দু ও আদিবাসী সমাজে বিবাহ বা শুভকর্ম উপলক্ষে বৃক্ষপত্রাদি গুরুত্বপূর্ণ উপকরণরূপে গণ্য। বিবাহাদি শুভকর্মে শেওড়া অপাঙক্তেয় হয়েও বাঙলার বিভিন্ন অঞ্চলে সন্তানবতী নারীসমাজ কর্তৃক পূজিত হয়ে আসছে। মনেহয় বৃক্ষের উৎপাদিকা শক্তির জন্য কামনা এবং শেওড়াস্থিত অমূর্ত অশুভ শক্তি থেকে পরিত্রাণের জন্য বাঙালী মহিলা সমাজ এই বৃক্ষদেবীর পূজা করেন। অবশ্য শেওড়া গাছ উৎপাদিকা বা প্রজনন শক্তির ক্ষেত্রে অবান্তর হলেও বৃক্ষস্থিত অমূর্ত প্রেতিনীর কোপদৃষ্টি থেকে সন্তানসন্ততি রক্ষার ধারণা মহাভারতীয় ঐতিহ্যের অনুরূপ। এই দৃষ্টিকোণ থেকে অনুমান করা যায়—যে শেওড়াগাছ ছিল অশুভ শক্তির আবাস সেই শেওড়াই শিশুরক্ষয়িত্রী দেবী বনদুর্গায় রূপান্তরিত হয়েছে। কামিনী, শাল, পলাশ বৃক্ষকেন্দ্রিক যে বনদুর্গা পূজার উল্লেখ করেছি তা বোধহয় আদিবাসী প্রেততত্ত্ব থেকে মুক্তির প্রয়াস। এই সংস্কার বা পরিবর্তন প্রয়াস বৃক্ষদেবীকে শাস্ত্রীয় দুর্গা বা বনদুর্গার উচ্চ আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

বৃক্ষদেবতা বনদুর্গা অনেকের মতে তান্ত্রিক দেবী বিশ্বকোষে দেখি—'বনদুর্গা (স্ত্রী) তন্ত্রোক্ত দেবীমূর্তি। পূর্ববঙ্গে বনদুর্গা পূজা বিশেষ সমারোহের সহিত হইয়া থাকে। এই পূজা প্রায়ই কোন বিটপিবেষ্টিত খোলা বা উন্মুক্ত চত্বরে সমাহিত হয়। মানসিক করিয়াও অনেকে এই পূজা দেন।' (বিশ্বকোষ। সপ্তদশভাগ, পৃ. ৫০১)। বনদুর্গার কথা পরবর্তী কোন কোন শাস্ত্রেও উল্লিখিত হয়েছে। পুরশ্চর্যার্ণব গ্রন্থে বনদুর্গার উল্লেখ আছে। ধ্যানমন্ত্রে বনদুর্গার যে রূপ কল্পনা করা হয়—তা নিম্নোক্তরূপ—

দেবীং দানবমাতরং নিজমদাঘূর্ণ মহালোচনাং
দংষ্ট্রাভিমুখীং জটোলিবিলসন্মৌলিং কপালধ্বজম।
বন্দে লোকভয়ঙ্করীং মনকচিং নগেন্দ্রহারোজ্জ্বলাং
সর্পাবদ্ধনিতম্ববিম্ববিপুলাং বানান বহুবিস্রতীম্।

ভাবার্থ এইরূপ : 'দানবমাতা বনদুর্গা ধনুর্বানধারিণী, মেঘবর্ণা, লোকভয়ঙ্করী, ইহার বিশাললোচন নিজমদে বিঘূর্ণিত। দন্তের জন্য ইহার আননভীষণ। ইহার মস্তক জটাভারে শোভিত। ইনি

নরকপালের মালা ধারণ করেন। ভুজঙ্গহারে ইহার দেহ উজ্জ্বল। ইহার বিপুল নিতম্ববিম্ব সর্পের দ্বারা আবদ্ধ।' 'ঈশানশিবগুরুদেবপদ্ধতি' গ্রন্থে শক্রমারণের উদ্দেশে যে বনদুর্গাপূজার কথা বলা হয়েছে তিনি অনেকাংশে এই বনদুর্গার অনুরূপ অন্যত্র কেউ কেউ দেবী মণ্ডলচণ্ডীকে বনদুর্গারূপে অভিহিত করেছেন (সুকুমার সেনের, 'ইসলামী বাংলা সাহিত্য' (১৩৫৮) গ্রন্থে 'আঠারো ভাটির পাঁচালী' অধ্যায় দ্রষ্টব্য) এই বনদুর্গাই মুসলমান প্রাধান্যকালে অরণ্যসঙ্কুল দক্ষিণবঙ্গে বনবিবিতে রূপান্তরিত হয়েছেন। ইনিই বনচণ্ডী, বনষষ্ঠী বা বিশালাক্ষী। (বাংলার লৌকিক দেবতা (১৯৬৬) গোপেন্দ্রকৃষ্ণ বসু)। ঘা-পাচড়ার দেবী আর এক ভিন্ন বনদুর্গারূপে বাঙলাদেশের কোন কোন অঞ্চলে প্রচলিত আছে।

লৌকিক দেবদেবীর বিবর্তন ইতিহাস বিচিত্র ও কৌতুকপ্রদ। এইরূপ দেবদেবীর বিবরণ মানবদরদী ব্যক্তিমাত্রেরই কৌতূহল জাগ্রত করে। লৌকিক দেবদেবীর মধ্য দিয়ে আদিম ধর্মানুষ্ঠানের ক্ষীণধারা প্রবাহিত হয়ে চলেছে। এইরূপ ধর্মানুষ্ঠান মানবসমাজের যে পরিচয় সযত্নে রক্ষা করছে তা উপেক্ষার নয়। হিন্দু আদিবাসীসমাজ কর্তৃক পূজিত লৌকিক বৃক্ষদেবী বিবর্তনপথে ব্রাহ্মণ্য পূজাপদ্ধতির পৃষ্ঠপোষণা লাভ করলেও এর স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য নানা দিক থেকে প্রত্যক্ষ করা যায়। আলোচ্য বনদুর্গাপূজায় আদিম মানুষের ধর্মানুষ্ঠান স্মৃতি আজও বিদ্যমান।

পরলোকগত অধ্যাপক চিন্তাহরণ চক্রবর্তী বনদুর্গা বিষয়ক নানা তথ্য ও তত্ত্বের সন্ধান দিয়েছিলেন।

স্বর্গীয় ননীমাধব চৌধুরীর লৌকিক দেবদেবী বিষয়ক নিবন্ধাদি বিশেষ করে তাঁর 'বনদুর্গা' বিষয়ক নিবন্ধ থেকে প্রভূত সাহায্য গ্রহণ করেছি।

পুরুষোত্তম বিদ্যাবাগীশ

পরমেশ রায়

রবীন্দ্রনাথের পূর্বপুরুষ পুরুষোত্তম ছিলেন পিঠাভোগের জমিদার জগন্নাথ কুশারীর দ্বিতীয় পুত্র। জগন্নাথ পরে দক্ষিণডিহিতে বাস করতে আসেন। জগন্নাথের শ্বশুর মহাশয় শুকদেব তাঁকে খুলনা জেলার উত্তরপাড়া গ্রাম দান করেছিলেন। এসব তথ্য রবীন্দ্রজীবনীকার আমাদের জানিয়েছেন।

কোচবিহার রাজ-এষ্টেটের মন্ত্রী খান চৌধুরী আমানতুল্লা আহমেদ এবং আসামের প্রখ্যাত পণ্ডিত রায়বাহাদুর কনকলাল বড়ুয়া একজন পুরুষোত্তমের উল্লেখ করেছেন। ইনি হলেন পুরুষোত্তম বিদ্যাবাগীশ —কোচবিহার-রাজ নরনারায়ণের সভাপণ্ডিত। এই পুরুষোত্তম বিদ্যাবাগীশ যে কোন প্রদেশের অধিবাসী ছিলেন তার কোন নিশ্চিত প্রমাণ নেই। ফলে উপরিউক্ত দুই পুরুষোত্তম একই ব্যক্তি কিনা সে-সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ সৃষ্টি করে বিশেষতঃ যখন পুরুষোত্তম বিদ্যাবাগীশকে রবীন্দ্রনাথের পূর্বপুরুষ বলে পরিচয় দেওয়া হয়েছে।১

তাঁর 'পুরুষোত্তম বিদ্যাবাগীশ' নিবন্ধে কোচবিহার রাজ্যের দেওয়ান রায়বাহাদুর কালিকাদাস দত্ত লিখিত ঘটনার উদ্ধৃতি দিয়ে কনকলাল পুরুষোত্তম বিদ্যাবাগীশকে কামরূপী ব্রাহ্মণ বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।২ নরনারায়ণের আমলে কামরূপ বলতে কোচবিহার এবং নিম্ন-আসাম উপত্যকা ছাড়াও জলপাইগুড়ি রঙপুর ও মৈমনসিং জেলাকেও বুঝাত। কালিদাস দত্তের যে-উদ্ধৃতি কনকলাল দিয়েছেন তা থেকে জানা যায় তৎকালীন কোচবিহারের ব্রাহ্মণেরা ছিলেন মূলতঃ বৈদিক শ্রেণীর। এইসব ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা কামতাপুরের যেন্ রাজাদের, মহারাজ বিশ্বসিংহ, নারায়ণ এবং প্রাণনারায়ণের আমলে কোচবিহারে এসেছিলেন। এঁদের অধিকাংশ কনৌজ, মিথিলা এবং আসামের অধিবাসী ছিলেন। এঁরা কোচবিহার শহরের প্রান্তভাগ টাকাগাছ, খাগড়াবাড়ী, ময়নাগুড়ি, বাণেশ্বরে বসতি স্থাপন করেন। বিদ্যাবাগীশ মহাশয় কোন প্রদেশ থেকে এসেছিলেন তার নিশ্চিত কোনো প্রমাণ কনকলাল পান নি, তবে যেহেতু নরনারায়ণের আমলের অধিকাংশ ব্রাহ্মণই ছিলেন বৈদিক শ্রেণীর, অতএব, তাঁর মতে, পুরুষোত্তমও অবশ্যই কামরূপী ব্রাহ্মণ।

আমানতুল্লা সাহেব অবশ্য সেরকম কোনো সিদ্ধান্ত নেন নি। তবে পুরুষোত্তম বিদ্যাবাগীশ গৌড়রাজের সভাপণ্ডিত ছিলেন এরকম মন্তব্য করেছেন। নরনারায়ণ একবার গৌড় আক্রমণ করেছিলেন। কিন্তু '…মহারাজ নরনারায়ণ গৌড় আক্রমণ করিলেও জয়লাভ করিতে পারেন নাই। যুদ্ধে তাঁহার সেনা এবং সেনানী পরাজিত, সেনাপতি শুক্লধ্বজ বন্দী, হতাবশিষ্ট সৈন্যদল সুদূর তেজপুর পর্যন্ত তাড়িত এবং রাজা স্বয়ং অতিকষ্টে পলায়নপূর্বক আত্মরক্ষা করেন।…দরঙ্গবংশাবলীতে লিখিত আছে যে একদা গৌড়েশ্বরের মাতাকে সর্পে দংশন করিলে শুক্লধ্বজের চিকিৎসায় তিনি বিষমুক্ত হইয়াছিলেন। এই উপকারের প্রতিদানস্বরূপ রাজমাতা শুক্লধ্বজকে 'পুত্র' সম্বোধন এবং মুক্তি প্রদান করিয়া পাঁচটি সদ্যশজাত কন্যার সহিত তাঁহার বিবাহ দেন…। মতান্তরে, করতোয়া নদীকে মধ্যসীমা করিয়া তাহার পূর্বদিকে অবস্থিত সমস্ত ভূভাগই শুক্লধ্বজকে যৌতুক প্রদত্ত হইয়াছিল…। তিনি

(গৌড়েশ্বর) এই সময়ে (পুরুষোত্তম) বিদ্যাবাগীশ এবং (পীতাম্বর) সিদ্ধান্তবাগীশ উপাধিমণ্ডিত প্রসিদ্ধ পণ্ডিতত্রয়কে স্বদেশে আনয়ন করেন। তাঁহারা গৌড়রাজের সভাপতি ছিলেন…।'৩ পণ্ডিত ত্রয়ন কামরূপে আসতে প্রথমে সম্মত হন নি; রাজা তাঁদের 'জীবিকানির্বাহের উত্তম ব্যবস্থা এবং দৈনিক একশত মুদ্রা বৃত্তিদানের অঙ্গীকার করায় তাঁহারা সম্মত হইয়াছিলেন।'

প্রকৃতপক্ষে পুরুষোত্তম বিদ্যাবাগীশ যে কোন্ প্রদেশের অধিবাসী ছিলেন তার কোনো নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া যায় না। কনকলালের নিবন্ধেও কোনো নির্দিষ্ট সূত্র নেই যা থেকে কোনো ধারণা গড়ে উঠতে পারে। তাহলেও, যেহেতু এই ব্রাহ্মণেরা ছিলেন মূলতঃ বৈদিক শ্রেণীর এবং যেহেতু বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণেরা ছিলেন তৎকালীন কামরূপের অধিবাসী, সেহেতু কনকলাল পুরুষোত্তমকে কামরূপী বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। অবশ্য তিনি পুরুষোত্তমকে অসমীয়া বলতে রাজী হন নি যতক্ষণ না প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে যে পুরুষোত্তম নিম্ন-আসাম উপত্যকারই অধিবাসী ছিলেন।৪

আমানতুল্লা-কৃত ইতিহাস অনুসরণ করে যদি ধরে নেওয়া যায় যে পুরুষোত্তম বিদ্যাবাগীশ গৌড়রাজের সভাসদ ছিলেন তবে প্রশ্ন ওঠে গৌড়রাজ কোন প্রদেশ থেকে তাঁকে এনেছিলেন? কনৌজ মিথিলা অথবা নরনারায়ণের আমলের কামরূপ থেকে? না কি দক্ষিণডিহি বা উত্তরপাড়া থেকে? তাঁকে কি নিশ্চিতভাবে কামরূপী বৈদিক বলা চলে?—বিশেষতঃ যখন কোনো বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ নেই যে তিনি কামরূপের অধিবাসী ছিলেন।

নরনারায়ণের রাজসভা থেকে পুরুষোত্তম বিদ্যাবাগীশ ও পীতাম্বর বিদ্যাবাগীশ পরে দরং রাজসভায় চলে আসেন। পীতাম্বর আসামেই থেকে যান। তাঁর বংশধর এখন মঙ্গলদৈ মহকুমায় থাকেন। কিন্তু পুরুষোত্তম সম্বন্ধে আর কোনো সংবাদ নেই। এমন হতে পারে তিনি দরং রাজসভা থেকে স্বগৃহে চলে যান। তাঁর বংশধর মহেশ্বর ও শুকদেব পরে কলকাতায় বাস করতে শুরু করেন। সেক্ষেত্রে পুরুষোত্তম বিদ্যাবাগীশকে দক্ষিণডিহি বা উত্তরপাড়ার অধিবাসী স্বীকার করে নিতে হয়। আর যদি কনকলালের সিদ্ধান্ত মেনে নিতে হয় তবে রবীন্দ্রজীবনীকার বর্ণিত পুরুষোত্তম এবং পুরুষোত্তম বিদ্যাবাগীশ যে এক ব্যক্তি নন তা প্রমাণ হয়ে যায়।

সে যাই হোক পুরুষোত্তম বিদ্যাবাগীশ তাঁর উপযুক্ত রাজসভাতেই এসেছিলেন। কোচবিহারের রাজাদের মধ্যে নরনারায়ণের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ্য এই কারণে যে তিনি দেশের নামজাদা পণ্ডিতদের তাঁর সভায় একত্রিত করে সাহিত্য সংস্কৃতির চরমোৎকর্ষের পরিচয় রেখেছেন। তিনি নিজেও বিদ্যোৎসাহী পুরুষ ছিলেন। পিতা বিশ্বসিংহের প্রতি অভিমানবশতঃ তিনি বারাণসীর জনৈক সন্ন্যাসীর আশ্রমে থেকে ব্যাকরণ সাহিত্য জ্যোতিষ শ্রুতি স্মৃতি ন্যায় মীমাংসা পুরাণ প্রভৃতি নানা শাস্ত্রে জ্ঞানলাভ করেন। তাঁর সময় সংস্কৃত ভাষার বিশেষ প্রসারলাভ ঘটে। এমন কি রাজসভাতেও সংস্কৃত ভাষায় কথোপকথন হত—

সংস্কৃত বিনে আন মাত ন মাত্য়।
সামান্য কথাকো সবে সংস্কৃত কয়॥

(মহাপুরুষ শঙ্করদেব ও মাধবদেবের জীবন চরিত্র)

রাজকার্যে মূর্খ কর্মচারীর নিয়োগ নিষিদ্ধ ছিল। তাঁর সময় কোনো এক দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত নাকি

কোচবিহার রাজসভার পণ্ডিতদের সঙ্গে তর্কযুদ্ধে পরাস্ত হয়েছিলেন। পণ্ডিত অনিরুদ্ধ, রাম সরস্বতী, শ্রীধর দৈবজ্ঞ, বকুল কায়স্থ, অনন্ত কন্দলী প্রভৃতি আসামের এবং অন্যান্য প্রদেশের প্রখ্যাত পণ্ডিতরা নরনারায়ণের রাজসভা অলংকৃত করতেন। মহাপুরুষ শঙ্করদেব এই রাজসভায় থেকে অনেক গ্রন্থ রচনা করেন। তৎকালীন কামরূপও সেই সময় শিক্ষাদীক্ষার দিক থেকে তাঁর কাছে ঋণী। সেইজন্যই আসাম সাহিত্যসভা তাঁকে 'আসামের বিক্রমাদিত্য' বলে অভিহিত করেছিল।

নরনারায়ণের আদেশেই পুরুষোত্তম বিদ্যাবাগীশ ১৫৬৮ খৃষ্টাব্দে সংস্কৃত ভাষার বিখ্যাত ব্যাকরণ 'প্রয়োগরত্নমালা' রচনা করেন। প্রায় একশত বৎসর পূর্বে কোচবিহার ষ্টেট প্রেসে মুদ্রিত এই বৃহদাকার 'প্রয়োগরত্নমালা ব্যাকরণম্'-এর ভূমিকা লেখেন পণ্ডিত সিদ্ধনাথ বিদ্যাবাগীশ। ভূমিকা থেকে জানা যায় এই 'ছন্দোবন্ধকারিকাবলীঘটিত ললিতকোমলপদাবলীবিশিষ্ট প্রয়োগরত্নমালা ব্যাকরণ প্রস্তুত করিয়া' পুরুষোত্তম নরনারায়ণের বিশেষ 'প্রীতিউৎপাদন' করেছিলেন। 'এই ব্যাকরণের প্রয়োগগুলি রত্নশ্রেণিতুল্য হওয়ায় ইহার প্রয়োগরত্নমালা নামটি যে সার্থক হইয়াছে ইহা মুক্তকণ্ঠেই বলিতে হইবে।' পণ্ডিত জয়কৃষ্ণ ভট্টাচার্য, জীবেশ্বর ভট্টাচার্য এবং সিদ্ধনাথ বিদ্যাবাগীশ এই ব্যাকরণের পৃথক টীকা প্রণয়ন করেন। এই ভূমিকা থেকে জানা যায় যে পুরুষোত্তম ছিলেন খাগড়াবাড়ীর অধিবাসী। খাগড়াবাড়ী অধুনা কোচবিহার শহরের অন্তর্ভুক্ত।

১। কলিকাতার পাথুরিয়াঘাটার 'ঠাকুর' জমিদারগণ পণ্ডিত পুরুষোত্তমের বংশধর বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন।—কোচবিহারের ইতিহাস / খান চৌধুরী—আমানতুল্লা আহমেদ (ক) Purusottam Vidyavagish / Early History of Assam / K. L. Barua ২। ঐ ৩। কোচবিহারের ইতিহাস ৪। রবীন্দ্রনাথের পূর্বপুরুষ অসমীয়া ছিলেন একদা এমন দাবী উঠেছিল। যাঁকে কেন্দ্র করে এ দাবী উঠেছিল তিনি হলেন পুরুষোত্তম গজপতি বিদ্যাবাগীশ নন। গজপতি ছিলেন ওড়িশার রাজা।

(দ্রঃ—কোচবিহারের ইতিহাস / Early History of Assam)

মানভূমের কথ্যশব্দার্থ

রামশঙ্কর চৌধুরী

ড

ডঙা—ছোট নৌকো

ডগা—লতার অগ্রভাগ

ডাসা—পঙ্কতার পূর্বাবস্থা।

ডব্বরা—(ডবা দেখুন)।

ডব্বরা—পাতার তৈরী বাটি সদৃশ বস্তু।

ড্যাব্‌রা—বড়ো বড়ো।

ডেঙ্গা—অবিবাহিত।

ড্যাগ্‌রা—ছেলে যার পেটটি ফুলা।

ডিগ্‌র্—দুষ্ট।

ডম্—ডোম।

ডংডগা—জলের মতন পাৎলা।

ডালিম্—বেদানা।

ডাগ্‌র্—বড়ো।

ডোরি—কোমরে লাল রঙের সুতো।

ঢ

ঢ্যাংগা—লম্বা

ঢোল্—বাদ্যযন্ত্র। ঢিলে ঢালা।

ঢোলক্—ঢোল থেকে ছোট বাদ্যযন্ত্র।

ঢিপ্‌সা—মেদবহুল শরীর।

ঢুং—ছিনালিপনা।

ঢিলু—ক্রমশ নীচু।

ঢালু—ঐ

ঢিবা বা ঢিপি—স্তূপ।

ঢ্যালা—ঢিল।

ঢিসাই—ভূরি ভোজনের পর পেট অত্যন্ত ভরে যাওয়া।

ঢলঢলা—গায়ের মাপের থেকে অনেক বড়ো জামা।

ঢাংলড়সা—ঢাঙা।

ঢেরা—দড়ি তৈরী করার সরঞ্জাম।

ঢুসা—মাথা দিয়ে আঘাত করা।

ঢাউস্—বৃহৎ ঘুড়ি।

ত

তরা—সিদ্ধ করে তেল দিয়ে ভাজা।

তেলা—তল। চাঁদা সংগ্রহ করা।

তাড়া—কুটি মাটিতে এক তাড়া খড়ের হিসাব।

তুষ—ধান থেকে চাল বের করে নেওয়ার অবিশিষ্টাংশ।

তক্‌ড়া—বেটে।

ত্যাঁদড়্—চালাক।

ত্যাল্—তেল।

দ

দ—দহ।

দা—কাস্তে।

দোখনা—দক্ষিণ।

দ্যাদার—অনেক।

দুখা—ব্যথা,

দুখ্ খাওয়া—প্রসব বেদনা।

দড়্‌কচা—যে ফল না পেকে শুকিয়ে যায়।

দল্লনা—দোলনা।

দুধ-চিড়্যা—একটি অনুষ্ঠান। প্রথম পোয়াতীকে দশ মাসে খেতে দেওয়া হয়।

দৈক—গর্ত।

দুমড়া—ভাঁজ করা।

দোখ্‌না—দক্ষিণ দিক।

দুয়া—দোওয়া।

দিগ—বিরক্ত।

দিশা—চেতনা।
দেহাৎ—গ্রাম।
দেহাতী—গ্রামের লোক।
দঁড়া—কালো বর্ণের পিপীলিকা সদৃশ কীট।
দড়া—ঘষা, মোটা দড়ি।
দেখ্যরা—এক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ যারা শ্রাদ্ধ বাড়ীতে গিয়ে ঘটি বাজিয়ে মৃতের স্বর্গবাস কামনা করে আর তার পরিবর্তে নগদ বিদায় চায়।

ধ

ধাই—ধাত্রী।
ধার—ভিক্ষনতা, ঋণ।
ধারী—দেয়াল সংলগ্ন বসবার জন্য মাটির বেঞ্চ।
ধাড়া—স্রোত, বৈশাখ মাসে দ্বিপ্রহরে গৃহ দেবতাকে যে ভোগ দেওয়া হয় দই আর ছোলা ভিজা।
ধরণ—ঠিক সময়ে বৃষ্টি না হওয়ার অবস্থা।
ধকল—বিপত্তি, বিপদ।
ধানাই-পানাই—ঠিক বক্তব্য প্রকাশ না করে বক্তব্যকে ভারাক্রান্ত করে তোলা।
ধান্দা—মতলব।
ধান্দাবাজ—মতলববাজ।
ধাংড়া—দোয়ান।
ধ্যাইমি—কাজ করার ক্ষমতা না থাকা সত্ত্বেও কাজ করতে এগিয়ে যাওয়া।
ধোংলা—উদলের নীচের রাখা কাঠ।
ধুলট—চব্বিশ প্রহর বা অষ্ট প্রহর কীর্তনের শেষের দিন।
ধোবো—পরিষ্কার। সাদা।

ন ও ণ

ন—না।
নাং—উপপতি।
ননদ প্যাটারি—বিয়ের সময় মেয়ের বাড়ী থেকে ঠাকুরঝিদের জন্য উপহার যে বাক্সোয় দেয়া হয়।
ননদ—ঠাকুরঝি।
নন্দাই—ননদের স্বামী।
নাদা—বড় হাঁড়ি।
নাড়ী—বিধবা।
নাককাটা বা নাকদনা ফুল—দোপাটি।
ন-না—ছোট ছেলে বা মেয়ে।
নুনু—ছোট ছেলে, পুরুষাঙ্গ।
নুনা— ঐ
নুনী—ছোট মেয়ে।
নুন—নিমক।
নাফা—লাভ।

প

পা—পদ।
পাঁশ—ছাই।
পালা—গাছের পাতা, নাটক, একের পর আরেক॥
পালি—কাজের বিভিন্ন সময়—যথা রাত পালি মানে night duty
পাছড়া—সূপ দিয়ে ঝাড়া।
পারা—ন্যায়।
পানা—রস।
পাখা—গোরু বাধবার দড়ি।
পাগা— ঐ
প্যাংসারি।
পাঁচুতা—প্রসবের পঞ্চম দিন।
পাতাই—পাতা দিয়ে তৈরী ঢাকনা যুক্ত বাটি সদৃশ পাত্র এতে পূজো পার্বনের পর মিষ্টি পাঠানো হয়।
পাতা—একের সঙ্গে অন্যের বিশেষ সম্পর্কিত হওয়া।

আন্তর্জাতিক আইনের সংকট

মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক ক্রমেই এক বিস্তৃত মোহনাতে এসে মিলিত হতে চাইছে। পরিবার ছেড়ে পাড়া, পাড়া ছেড়ে দেশ, তারপর দেশ ছেড়ে বিদেশ অনবরত মানুষের পারস্পরিক আদান-প্রদানের স্পৃহা গণ্ডী ছাড়িয়ে বিশ্বপরিবারে দিগন্তচারী হতে চাইছে। কিন্তু সকল ইচ্ছাই কার্যকালে কতকগুলি বিধি-নিষেধের দ্বারা সীমিত, নির্দ্ধারিত। এবং এই বিধিনিষেধের কাছেই কালক্রমে বিশ্ব-পরিবার সমূহ প্রণত ও বিনত। ব্যাপক বিশ্বে জাতিসমূহ যে বিধিনিষেধের দ্বারা পরিচালিত তারই নাম আন্তর্জাতিক আইন। কিন্তু পরিচালক হিসাবে এই আইনকে স্বয়ং সম্পূর্ণ এবং সুগঠিত বলতে দ্বিধা আছে আইন পাঠকমাত্রেরই মনের কোণে। গবেষক গুণীজনেদের কথা নাইবা তুললাম। আন্তর্জাতিক আইনের অসারতা প্রমাণ করবার জন্যে দেশেদেশে আইনজ্ঞরা যুগে যুগে কত কথাই না উচ্চারণ করেছেন? প্রকাশ করেছেন কত সংশয়, কত দ্বিধা। শুনিয়েছেন কত নিরাশার নিরানন্দ বাণী। অস্টিন ও হবসের মতন লেখকদের নক্কারজনক বিবৃতির কথা আমরা জানি। জানি স্যালরুণ্ডের সংযত, সুমিত, সচেতন বাক্যালাপ, "এ কেবল সৌজন্যবোধের আইন।" অধ্যাপক হলাণ্ডের কথাও কানে বাজে, মর্মান্তিক না হলেও বাজে, 'বিচারকের প্রজ্ঞার বিলুপ্তির সীমা হলো এই আইন।'

এ-সমস্ত বক্তব্যকে যুক্তি দিয়ে হয়তো আমরা কাটিয়ে দিতে পারি এবং অতঃপর তৃপ্ত হতে পারি এই ভেবে যে, একটি সুন্দর হীরকদণ্ড দিয়ে কেটে ফেললাম একরাশ কাঁচের পাতকে। কিন্তু তাতে আমরা কতদূর অগ্রসর হতে পারবো? পারবো কি সত্যকার সংশয়, দ্বিধা, দ্বন্দ, সংকট ও সংশয়ের ঘোর কাটিয়ে এক মেঘমুক্ত নীলিমার নীচে পঙ্খ পাখায় ভর করে পলাশের অঞ্জলিতে মুগ্ধ হতে? সত্যকাম অঙ্গীকারে তিমিরাভিসারের ভিতর দিয়ে প্রতীকের সাহায্যে অগ্রহায়ণের বলীয়ান রৌদ্রের প্রান্তরে আসতে?

এই যে অনন্ত জিজ্ঞাসার আকাশবাণী বারবার ব্যাপ্ত করে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডল তার পিছনে অবশ্যই আছে নানান কারণ, অসংখ্য বিষয়ের কথামালা। ক্রটিবিচ্যুতির বিস্তীর্ণ মরুরেখা। সংকটের মেঘ ঘনায় তাই। মেলে না সাধারণের মনে সন্তোষের সরসতা।

এই আইন ধারাবাহিক নয়। কোন্ বিশেষক্ষেত্রে কোন্ বিশেষ আইনটিকে প্রয়োগ করতে হবে তা' ঠিক করা রীতিমত শক্ত ব্যাপার। এই আইনের ধারা সমূহ অস্পষ্ট এবং ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত। আইনের ধারাগুলিকে বিচ্ছিন্ন করতে হয় সন্ধি, চুক্তি; আচার আচরণ: পররাষ্ট্র দপ্তরের নথিপত্র এবং নানাবিধ আন্তর্জাতিক সম্মেলনের নথিপত্র থেকে। বিষয়টি যথেষ্টই সময়হারী। এই কারণেই কোনো একটা নির্দিষ্ট বিষয়ে আইনের বিধি কি তা খুঁজেপেতে সংশ্লিষ্ট সংকটাপন্ন রাষ্ট্রকে বিশেষ বেগ পেতে

হয়। হাতড়ে মরতে হয় অন্ধকারে। না হয় অন্ধকার হাতড়েই খুঁজে পাওয়া গেল আলোর উৎসটিকে। কিন্তু সেই আলোই যে সংকটের ঘোর কাটিয়ে দিতে পারবে উত্তরণ সে ভরসাই বা কোথায়? বড় বড় রাষ্ট্রগুলি এই আলোর ব্যাপারে যথেচ্ছাচারী। আর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের দান এই আলোকে মায়াবী আলো, আলেয়া বলেই ধারণা।

পৌর আইনকে পরিচালনার জন্যে আছে বিধানসভা। আছে সংসদ। লোকে ভালো করেই জানে কোন একটা বিশেষ ব্যাপারে, সমস্যার সমাধানে সংশ্লিষ্ট আইনটি কি? কিন্তু আন্তর্জাতিকক্ষেত্রে কেউ তেমনভাবে বলতে পারে না আইনের বিধান কি হবে? ঔচিত্যের প্রশ্ন নাইবা তুললাম। কেন না সেখানে এমন কোন আইন সভার অস্তিত্ব নেই। তাছাড়া সমাজতো স্থিতিশীল নয়, স্থিতিশীল নয় রাষ্ট্রযন্ত্রের রূপ এবং ভূগোলও সময়ের মতন গতিশীল ও দিক্‌পরিবর্তনকারী। অনবরত পরিবর্তনের স্রোত বয়ে চলেছে সময়ের নদীতে;—রব উঠেছে স্থিতিশীল অধিকারগুলিকে পালটাতে হবে; নোতুন সীমারেখা নির্দ্ধারণ করতে হবে, দিতে হবে রাষ্ট্রীয় জলপথের আরও অধিক সীমানা। ব্যোমপথের আরও অধিক বিস্তৃতি। পর্বতমুহ কি কারও একার, নিজস্ব? আবার সাগর, গিরিকুন্তলা বনরাজি নীল বহু বিচিত্র এই পৃথিবী এবং অধুনা সারা জ্যোতিষ্কলোক, অন্য গ্রহেরও ক্রন্দন কার অধিকারে কতটুকু? অসংখ্য জিজ্ঞাসার ঢেউ আজ তরঙ্গ তুলেছে আন্তর্জাতিক আইনের বেলাভূমিতে।

স্থিতিশীল আইনকানুনের দ্বারা কখনোই এই সব কলহের নিষ্পত্তি হতে পারে না। এর জন্য দরকার নোতুন আইনের। নোতুন বিধানের। আন্তর্জাতিক আইনের ক্ষেত্রে সেই আইনসংস্থাপক বিধানসভাটি কোথায়? কোথায় বা সংসদ? কোথায় সংহতি?

এই আইনতো পৌর এবং অন্তর্দেশীয় আইনের মতন বিধানসভা এবং অথবা কেন্দ্রীয় সংসদ আইন পরিষদের সৃষ্টি নয়। কেবলমাত্র পারস্পরিক বোঝাপড়ার ভিত্তিতে সৌজন্যবোধ ও আচার আচরণকে সংগৃহীত করে আন্তর্জাতিক আইনের শকট কতদূর গমনেই বা হবে সক্ষম? পাবে কি সর্বত্র তার প্রবেশের দ্বার? না কি বাঁধা হয়ে থাকবে বেড়াগুলি তার জীবনযাত্রার এবং এমনই এক জীবনযাত্রা যা' অস্পষ্ট, ধূসর, মনোরম কল্পনাময় এবং নভোচারী কদাচিত বাস্তবের মৃত্তিকায় সমাসীন, সুদৃঢ়। প্রখ্যাত আইনজীবী প্যাটন লক্ষ্য করেন; "সংস্থাগত দিক থেকে বড়ই দুর্বল হলো আন্তর্জাতিক আইন—নেই কোন বিধানসভা, এবং, যদিও অস্তিত্ব বিরাজ করছে একটি বিচারালয়ের, তা' কেবল পরস্পরের সম্মতি স্বাক্ষেপেই কার্যক্ষম, প্রকৃতপক্ষে তার সিদ্ধান্তকে মানানোর কোনই শক্তি নেই তার। যদিও একথা সত্য যে আন্তর্জাতিক শান্তি কদাচিৎ ভঙ্গ করা হয় কিন্তু যখনই কোনো শত্রু সমস্যার উদ্ভব হয় তখনই দেখতে পাই স্বীকৃত বিধানের প্রতি কী দারুণ অবিশ্বাস। বিজ্ঞজনমত অবশ্যই এমন একটি ব্যাপার থাকে কদাচিৎ অস্বীকার করা চলে, কি আইনভঙ্গকারী জাতিটিকে নিয়ন্ত্রণ করা খুবই খুবই শক্ত বিষয় যদি না তাকে বহিষ্কার করা হয় সমাজ থেকে যেমন করে আদিবাসীকে বহিষ্কার হয়ে থাকে—তাই যখন আদিবাসীর এবং আন্তর্জাতিক আইন উভয়েরই সংস্থাগত কোন কার্যযন্ত্র নেই, তখন প্রথমটির আবশ্যকতা খুবই কার্যকরী কেন না তা' জাতির উপরে নয়, ব্যক্তির উপরেই বর্তায়।" পৃথিবীর ইতিহাস প্যাটনের এই পার্যবেক্ষণের স্বপক্ষে অসংখ্য

ঘটনারই নজির দাঁড় করাবে। অতীতের কথা ছেড়েই দিলাম। অধুনা আফ্রিকা ও এশিয়ার দেশগুলিতে এবং ল্যাটিন আমেরিকায়—অর্থাৎ, এককথায় নানানভাবে নানান আন্তর্জাতিক যে সব সমস্যার উদ্ভব হয়েছে তার সমাধানের সূত্র খুজতে গিয়ে প্রতি পদে পদে আজকে আমাদের অনুভব করতে হচ্ছে আন্তর্জাতিক আইনের সংকট।

পৌর এবং অন্তর্দেশীয় আইনকে প্রয়োগ করার জন্য রয়েছে বিচারালয়। তাই বিচারালয়ের অধিক্ষেত্র সম্পর্কে প্রতিটি নাগরিক সচেতন। সকল প্রকার পৌরকলহের শুনানী ও রায়দান করে থাকে এই বিচারালয়। কিন্তু আন্তর্জাতিক আইনেরক্ষেত্রে এমন কোন বিচারালয় কোথায়? বলতে পারা যায় যে, আন্তর্জাতিক ন্যায় বিচারালয়তো আছেই। এছাড়া আন্তর্জাতিক ন্যায়ধীশেরাওতো রয়েছেন। কিন্তু তাদের ক্ষমতা কতটুকু? তাঁরাতো সকল প্রকার কলহের নিষ্পত্তি ঘটাতে পারে না। তাছাড়া সকল রাষ্ট্রইবা এই বিচারালয়ের সহায়তা লাভ করছে কোথায়? কেবলমাত্র সম্মিলিত জাতিসঙ্ঘের যারা সদস্য তারাই এই বিচারালয়ের কাছে বাধ্য ও অনুগত। কিন্তু এই আনুগত্যও সীমাবদ্ধ। যারা সম্মিলিত জাতিসঙ্ঘের সদস্য নয় তাদের আন্তর্জাতিক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নেও এই বিচারালয়ের অধীনে আনা যায় না। কেবল তারা যদি স্ব ইচ্ছায় এই বিচারালয়ের কাছে আসে তবেই তার সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে, মীমাংসা ও উত্তরণের প্রশ্নে নাক গলাতে পারে আন্তর্জাতিক ন্যায় বিচারালয়। না হলে তার অবস্থা দাঁড়ায়, হয়তো দাঁড়িয়েছে ইতিমধ্যেই, গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল গোছের। তাহলেই বলতে হয় যে আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের সীমাবদ্ধতা সভ্যজগতের সর্বপ্রান্তে কখনোই তার আলোক অভিযান শুরু করতে পারে নি সমানভাবে।

অন্তর্দেশীয় পৌর আইনগুলির মতন সুস্পষ্ট উচ্চারিত, অভিব্যক্তও নয় আন্তর্জাতিক আইনের ধারাগুলি। মাননীয় প্রধান বিচারপতি লর্ড কোলরিজ, আর·বনাম কোন-র (ঘ ফ্র্যাঙ্কোনিয়া) মামলায় লক্ষ্য করেছেন :

'প্রকৃত প্রস্তাবে, আন্তর্জাতিক আইন হলো অস্পষ্ট উচ্চারিত, এবং অস্পষ্টতার একটা প্রবণতা রয়েছে বিভ্রান্ত করার যদি না এর অস্পষ্টতার কথা মনে রাখা যায়। আইন বলতেই আইন দাতার কথা বলতে হয় এবং একটি ন্যায়পীঠের যা' এই আইনকে বলবৎ করতে সক্ষম এবং আইন ভঙ্গকারীকে শাস্তি প্রদানে তৎপর। কিন্তু সার্বভৌম রাষ্ট্রসমূহের কোন সর্বজন স্বীকৃত সাধারণ আইন দাতা নেই; নেই কোন ন্যায়পীঠও যা' তাদের কোন ডিক্রি জারী করে বাঁধতে পারে বা তার অন্যথা হলে শাস্তি দিতে পারে। জাতি সমূহের আইন হলো সেই বিধি আচরণের সংকলন যাকে সভ্যরাষ্ট্রসমূহ তাদের পারস্পরিক ব্যবহারের ক্ষেত্রে মেনে নিয়েছে। এই বিধি আচরণগুলি কি, এদের কোন্‌টাকে মানা হয়েছে, কোনটাকে মানা হয়নি, অবশ্যই প্রমাণের বিষয় হতে হবে। রাষ্ট্রসমূহের সন্ধি এবং অন্যান্য কার্যবলী জাতিসমূহের চুক্তিরই প্রমাণসমূহ, তা কখনোই ন্যায়পীঠকে জাতিসমূহের পারস্পরিক সমস্যার রায়দানের ক্ষেত্রে বাঁধতে পারে।'

সন্ধিগুলি সবই অতীতের দর্পণ। তাতে বর্তমানে পথ চলার ইঙ্গিত পেতে হলে অন্তর্দেশীয় আভ্যন্তরীণ আইনের ধারার মতনই সুস্পষ্ট নির্দেশকারীর ধারা সংকলিত হওয়া উচিত। কিন্তু বস্তুত এক ভার্সাইর সন্ধি বাদে আর কোন সন্ধিতে, কোথাও কি এমন কোন সুস্পষ্ট নির্দেশ আছে যার দ্বারা

সমস্যাসংকুল রাষ্ট্রসমূহ তাদের বৈদেশিক নীতি পরিচালনার ক্ষেত্রে বর্তমানে এবং ভবিষ্যতেও বটে, যথার্থ মুক্তির পথ খুঁজে পেতে পারে ? তাই যদি হতো তাহলে আজ ১৮৯৯ সালে সংগঠিত হেগ সম্মেলনে গৃহীত ও স্বীকৃত স্থলযুদ্ধের আইন-কানুনকেই শ্রদ্ধা জানাতো যুদ্ধমান জাতিগুলি ; প্রয়োজন হতো না ১৯১৯ সালে গঠিত জাতিসঙ্ঘ (লীগ অফ নেশানস্)-কে ভেঙ্গে ফেলার। ধূলি লুণ্ঠিত হতো না লিলোগ ব্রায়াণ্ড চুক্তি বা ১৯২৮ এর প্যারিসের শান্তি চুক্তি ইত্যাদি। মানব সভ্যতার ইতিহাসে কলঙ্কের রেখা একে দেবার জন্য দেখা দিতো না পর পর দুটো বিশ্বযুদ্ধ। আর তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ সংগঠিত না হলেও তার চেয়েও ভয়ানক শান্তিযুদ্ধের মহড়াতো চলছেই।

কোন আদালতই তার বিধানকে পালন করাতে পারে না পুলিশী শক্তি ছাড়া। যে দপ্তর এই শক্তিকে পরিচালিত করে থাকে (নির্বাহিকা দপ্তর) তার কোন অস্তিত্ব অদ্যাপি দেখা যায় নি আন্তর্জাতিক আইনের ক্ষেত্রে। কাজেই যখন কোন রাষ্ট্র অপর কোন রাষ্ট্রের প্রতি তার কর্তব্য পালন করতে চায় না, প্রকাশ করে উদাসীনতা কিংবা অবাধ্যতা, তখন তাকে বাধ্য করাবার মতন কোন দপ্তর নেই আন্তর্জাতিক আইনের জগতে। ফলে প্রকটিত হয়ে ওঠে আন্তর্জাতিক আইনের অপূর্ণতার দিক। দেখা দেয় সংকট। আধি-ব্যাধি জরামৃত্যু লোক বিচ্ছেদের কারাবাস—হিরোসিমা, নাগাসাকী, কিউবা, কঙ্গো, ভিয়েতনাম।.....

জাতিসমূহের আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে বিশ্বের নেই আন্তর্জাতিক আইনের অধিক্ষেত্র। এতে কোন বৈদেশিকের মানবিক সম্মান ও মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হলেও আন্তর্জাতিক আইন তাতে হস্তক্ষেপ করতে বা নাক গলাতে পারে না। কর, শুল্ক, সীমানা, ব্যবসা-বাণিজ্য বাজার ইত্যাদি আন্তর্জাতিক আইনের আওতাধীন না হওয়াতে এইসব বিষয় নিয়ে জাতিসমূহের মধ্যে নানা বৈরীভাব, কলহ, মন-কষাকষি লেগে থাকে নিত্য-নৈমিত্তিক। ফলে অনেক সময়ই অনেক বৈদেশিককে জাতিসমূহের আভ্যন্তরীণ আইনের অন্যায় রকম শিকার হতে হয়। সহ্য করতে হয় পীড়ন, নির্যাতন। ইথিওপিয়ার আভ্যন্তরীণ আইনের কড়াকড়ি সম্পর্কে কটাক্ষ করে শ্রীমতী রাহু সান্যাল তাঁর শিবঠাকুরের আপনদেশ নামক গ্রন্থের এগার অনুচ্ছেদে আইন-কানুন সর্বনেশে বলে যে বিষয় ও অভিব্যক্ততার কথা লিখেছেন তা' অনুসন্ধিৎসু পাঠক/পাঠিকাকে পড়ে দেখতে অনুরোধ জানাই।

এ ছাড়াও আন্তর্জাতিক আইনের সংকটকে তীব্রতর করে তুলেছে রাষ্ট্রসমূহের উগ্র জাতীয়তা-বোধ। জাতীয় স্বার্থকে প্রায় প্রতিটি রাষ্ট্রই অত্যন্ত উর্ধে স্থান দিয়ে থাকে। যদিও বর্তমানকালে হিটলার-মুসোলিনী কাইজারের মতন উগ্র জাতীয়তাবাদী নেতার অস্তিত্ব খুব একটা নেই তথাপি আপন রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বের প্রশ্নে বিন্দুমাত্রও আত্মত্যাগ করতে রাজী নন কোন দেশের নেতা বা নেত্রী।

আন্তর্জাতিক আইনের সংকট দেখা দিয়েছে এর অতিমাত্রিক আত্মকেন্দ্রিকতার জন্যেও বটে। ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী জহরলাল নেহেরু লক্ষ্য করে করেছিলেন যে, আন্তর্জাতিক আইন গড়ে উঠেছে এখন পরাস্ত ইউরোপীয় পরিবার সমূহের ধ্যান-ধারণার পরিপ্রেক্ষিত থেকেই যা' ছিল বিগত শতাব্দীতে প্রবল, প্রভুত্ব পরায়ণ এশিয়া ও আফ্রিকার জাতিসমূহের উপরে। অধ্যাপক শোয়ার্জেনবার্গার লক্ষ্য করেছেন যে আন্তর্জাতিক আইনের অধীনস্থরা খুবই আত্মকেন্দ্রিক। তারা কখনোই আন্তর্জাতিক সংস্থার কার্যাবলীতে অংশগ্রহণে ইচ্ছুক নয়, সেইসব কার্যাবলী তারাই অপর্যাপ্ত পরিমাণে সমাধা করতে

পারে। তারা শেষ পর্যন্ত তাদের নিজস্ব ক্ষমতায় বিশ্বাসী এতই যে তা' সুসমঞ্জস অথবা সুসংগঠিত আইনব্যবস্থা গড়ে তুলতে তা' অনুকূল নয়। অর্থাৎ কার্যক্ষেত্রে তারা একটি শক্তিশালী বিশ্বসংগঠন গড়ার চিন্তাকে হারিয়ে ফেলে এমনভাবে যে বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তার তখন ধূলি লুণ্ঠিত হওয়া ছাড়া আর কোনই বিকল্প থাকে না। এই আত্মম্ভরিতা আন্তর্জাতিক আইন বিকাশের পক্ষে এক বিরাট বাধা—তীব্রতর সংকট।

অনুসন্ধান করলে দেখা যায় আন্তর্জাতিক আইনের আর একটি অন্যতম সংকট হলো দেশগুলির রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থান। বর্তমান বিশ্বের সমস্ত রাষ্ট্র বর্তমান সময়ে মোটামুটিভাবে দুটি গোষ্ঠীতে বিন্যস্ত হয়ে গেছে—পুঁজিপাতি গোষ্ঠী ও সমাজতান্ত্রিক গোষ্ঠী। নিরপেক্ষ দেশও না আছে যে, এমন নয়। কিন্তু সেইসব নিরপেক্ষ দেশগুলিতেও প্রভুত্ব পরায়ণ পুঁজিপাতি গোষ্ঠী সুযোগ ও সুবিধা মতন হস্ত সম্প্রসারণ করছে। তাতে খুব স্বাভাবিক কারণেই এমন সব সমস্যার উদ্ভব হচ্ছে যা' আন্তর্জাতিক আইনের বিষয়। কিন্তু তা' সমাধান করতে গিয়ে আন্তর্জাতিক আইন হিমসিম খাচ্ছে কেননা মীমাংসার ভার প্রায়ই ন্যস্ত হতে দেখা যাচ্ছে শক্তিশালী রাষ্ট্র সমূহের উপর। তারা যে রায়প্রদান করেছে তা অপেক্ষাকৃত দুর্বলদেশগুলি আনন্দিত মনে গ্রহণ করতে পারছে না। ফলে সাময়িক ছেদচিহ্ন পড়লেও প্রকৃত সমস্যার সমাধান ঘটছে না। আবার সেই সমস্যা সুযোগ মতন যে কোন রুদ্ধ পথে আত্মপ্রকাশ করছে। মাঝে মাঝে খুবই ভয়ানকভাবে আত্মপ্রকাশ করছে। বড় বড় রাষ্ট্র ও জাতিগুলি ছোট ছোট রাষ্ট্র ও জাতিগুলির ক্ষেত্রে, সমস্যার মীমাংসার সময় যে সব মাতব্বরি করে আসছে অনেকদিন থেকে তাকে অনেক সময় মেনে নিলেও ঠিক মনের মধ্যে নির্দ্বিধাভাবে গ্রহণ করতে পারছে না ছোট ছোট রাষ্ট্রগুলি। তারা বড় বড় রাষ্ট্রগুলির মধ্যস্থতা এবং সালিশীকে সন্দেহাতীত ভাবে গ্রহণ করছে কদাচিৎ। রাষ্ট্র সঙ্ঘের নানান নির্দেশকে অত্যন্ত রূঢ়ভাষায় আক্রমণ করা হয়েছে নানান সময়। আলফ্রেড জিমর্ণ বলেছেন তাই, 'আন্তর্জাতিক আইন হল সালিশী ক্ষমতার কাঁধে চাপানো আইনবিদের সুন্দর পোষাকটি।' পৃথিবীর শক্তিশালী রাষ্ট্রসমূহ কদাচিৎ আন্তর্জাতিক আইনের নির্দেশ মেনে চলে। নামানাকেও মানানোর দায়িত্ব নেবার মতন সংস্থা নেই আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে। নেই আইন পরিষদ। নেই শাসনবিভাগ। বিচারবিভাগের প্রতিনিধিত্ব করছে যে আন্তর্জাতিক ন্যায় বিচারালয় তারও নেই বাধ্যতামূলক নিখিল অধিক্ষেত্র ; এর সিদ্ধান্তগুলি শেষ পর্যন্ত পারে না বিবদমান রাষ্ট্রগুলির বৈধ সমস্যাকে মিটিয়ে দিতে। চোখের সামনে জলজল করছে চীন ও রুশের সীমান্ত সমস্যার বিষয়। রয়েছে ভারতচীনেরও সীমান্ত সমস্যা। তিব্বতের প্রশ্ন ; ভিয়েতনাম পাকিস্থান ও বাংলাদেশের নানান সমস্যা।

আরও আরও কত সমস্যার জোয়ার নেমে আসে আন্তর্জাতিক আকাশ থেকে। মানুষেরা কিছুক্ষণ শুদ্ধে এবং অবশেষে রাষ্ট্রসঙ্ঘের কাছে তাদের কলরব ভরে রাখে, তারপর সর্বত্র একটা নীরবতা নেমে আসে ক্রমশ। হিম ও কুয়াশা অন্ধকারে ঘনীভূত হয়ে আসে। আর্ত, পীড়িত ব্যথিত মানুষ আস্থা হারিয়ে ফেলে আইন, ন্যায়, নীতি ও সমতার প্রশ্নে। মৃদুতা কেটে যায়। টুটে যায় সব স্বপ্নের ঘোর।

বলবানের হাতে দুর্বলের পীড়ন যতদিন চলতে থাকে, যতদিন মানবতার দেবায়তনে বৃহৎ শক্তি

জোটের কণ্ঠ থেকেই না বেরিয়ে আসে প্রীতি, শুভেচ্ছা ও সৌহার্দের বাণী—আন্তরিক এবং সর্তবিহীন ; স্বার্থে নয়, পরমার্থে ; হিতরত পালনের উৎসাহে উদ্দীপ্ত ততদিন আন্তর্জাতিক আইনের সংকট কাটছে না।

যেদিন আমাদের দুর্বলদেরও বটেই, বলবানেরও বিবেকের স্বরলিপি ক্ষমা ও সমালোচনায় ধৃত হবে ; আমরা ঘৃণা করবো আমাদের আপাতবিবেকী মনোবৃত্তিকে যার নামে অক্ষমতা কিংবা ক্লীবত্বও অনায়াসে চলে যায় (যায় না দেখেছি, অন্তর্দেশীয় পৌর আইনের ব্যাখ্যায় সিদ্ধান্তে পৌঁছতেও) সেইদিনই হবে শুভ সূচনা। আস্থা স্থাপন করতে পারবো আন্তর্জাতিক আইনের উপরে। তা নাহলে আইনের প্রশ্নে সাধারণ প্রতিটি মানুষের মতন অভিপ্রত আইনজীবীরাও প্রায় সময়ই শিউরে উঠবেন পৃথিবীজোড়া সংবেদন শূন্যতায়। মনে হবে তাঁদেরও প্রখ্যাত আইনবিদ স্যার নর্মান বার্কেটের মতনই, মানবআবহ যেন শোচনীয় রকম নিষ্প্রভাণ। এখানে সুযোগ সন্ধানী মার্জারীর প্রাপ্য পরাভব ঘটছে না। নিরীহদের সংশোধিত হবার অধিকার দেখা দিচ্ছে না।

সেইদিন দেবে, দেবে নিশ্চয়ই ; সেইদিনই হবে আন্তর্জাতিক আইনের সংকটমোচন। মানুষের নিখিল সমস্যামুক্তির সেইদিনই হবে স্বর্ণরেণু সংগ্রহ।

সুখরঞ্জন চক্রবর্তী

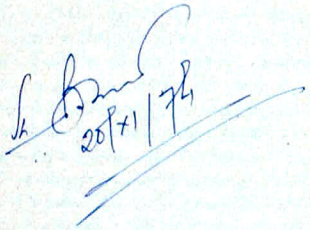

বাঙলার সামাজিক ইতিহাসের ভূমিকা [১১০০-১৯০০ খ্রীঃ]—সতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়, সাহিত্য সংসদ, কলিকাতা, এপ্রিল : ১৯৭৪, মূল্য ১৫ টাকা।

সমাজ ও সামাজিক ইতিহাসের মুখ্য উদ্দেশ্য আমাদের ইতিহাসের সামাজিক পটভূমিকাকে হৃদয়ঙ্গম করতে সাহায্য করে। আলোচ্য গ্রন্থটি একটি সাবলীল বা টানা স্রোতের মত তার বক্তব্যকে পাঠকের সামনে তুলে ধরেছে। গ্রন্থের এই দিকটিকে প্রশংসা করা যায়।

বাংলার সামাজিক ইতিহাসের সূচনা করা যেতে পারে অতি প্রাচীন প্রাগৈতিহাসিক ও তার কাছাকাছি কৃষিসমাজের সংবাদ দিয়ে। গত দুই দশকের গবেষণায় অজয়, রূপনারায়ণ, ময়ূরাক্ষী, দ্বারকেশ্বর, কংসাবতী প্রভৃতি নদীবিধৌত রাঢ়বঙ্গের উচ্চ-নীচ-সমতটে দেখা গেছে অজস্র পাথর-হাতিয়ার তৈরীর কেন্দ্র। সম্প্রতি বীরভূম-বর্দ্ধমান থেকে পাওয়া খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় সহস্রাব্দের কৃষিসমাজের কুটির, সমাধি-প্রক্রিয়া, গড়ন ও চিত্রণের সৌন্দর্যমণ্ডিত কৌলাল এক অভূতপূর্ব ঐতিহাসিক চেতনার স্তরে আমাদের নিয়ে গেছে সার্থকভাবে। প্রত্ন-সন্ধানের অবস্থান ও পারস্পরিক সংযোগ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রমাণে সামাজিক কাঠামোকে তুলে ধরে অকাট্য প্রমাণসহ। কিন্তু এই অতি প্রয়োজনীয় যুগের কথা আমাদের আলোচ্য পুস্তিকাটিতে নেই। রয়েছে 'অলচিন'দের লেখা বিদেশ হতে প্রকাশিত ভারতীয় উষাকাল সম্পর্কিত একটি সুপরিচিত গ্রন্থে ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রত্নতাত্ত্বিক অধিকারের কয়েকটি প্রকাশনায় এবং অধ্যাপক মাল্কালিয়া প্রমুখ কয়েকজনের প্রবন্ধে।

বাংলার ইতিহাস সূচনা হয়েছে খৃষ্টপূর্ব প্রথম সহস্রাব্দের সুরু থেকেই। তবে ঐতিহাসিক উল্লেখ বৈদিক যুগের অন্তিমপর্বে ও মহাকাব্যের কালের সময় থেকে বৌদ্ধ জৈন গ্রন্থাদিতে ও পুরাণকথায় ধরা আছে। মৌর্য বা প্রাক মৌর্যকালের থেকে গুপ্তযুগ ও তার অব্যবহিত পরের পোড়ামাটির কাজ, মুদ্রা ও মুদ্রাঙ্ক বিভিন্ন উপাদানের লেখমালা অজস্র। শিল্পরীতি ও বিষয়ের বিচারে এই সমস্ত নিদর্শন বাংলার স্থানীয় বিশেষত্বকে ফুটিয়ে তুলেছে। উত্তরবঙ্গের নানাস্থানে, পূর্ববঙ্গের কেন্দ্রবিন্দুতে ও পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিমাংশের উচ্চ ভূমিতে এবং দক্ষিণবঙ্গের সমুদ্রতটাশ্রয়ী অঞ্চলের থেকে যথাক্রমে মহাস্থান, পাহাড়পুর, ময়নামতী, বজ্রযোগিনী, ওসনিয়া, পান্ডা, পোখরনা, তমলুক, হরিনারায়ণপুর, চন্দ্রকেতুগড় প্রভৃতি প্রত্নকেন্দ্র থেকে অজস্র নিদর্শন বাংলার স্বকীয়তাকে অজস্র পুস্তকে, পত্রিকা, প্রবন্ধে সংগ্রহশালার চিত্রিত পত্রগুচ্ছে সহজলভ্য। এবং সামাজিক পটভূমিকা কি বাংলার ইতিহাসের অঙ্গ নয় ? কিন্তু এটিও আলোচ্য বইটিতে প্রায় উধাও হয়ে থেকেছে।

গ্রন্থকার ধরে নিয়েছেন পালযুগের মধ্যকালীন সময় থেকে বিশিষ্ট বাঙালী সামাজিকতার উদ্ভব। কিন্তু কি ভাবে আদিম উপজাতিক সাম্রাব রূপায়িত হয়ে অঙ্গীভূত হয়েছে আমাদের ভাষায়, পোষাক-পরিচ্ছদে, কাব্যরীতিতে তাও এখানে অনুপস্থিত। পালযুগের অপূর্ব প্রস্তরময় ও ধাতব ভাস্কর্য ফুটিয়ে

দেখিয়ে দিয়েছে বাংলার রুচিকে তার অপূর্ব অলঙ্কারের ও অঙ্গাবরণের নক্সায়। দেবমূর্তির নিম্নাংশে রয়েছে পুজারী আর উপাসক উপাসিকার চিত্র। এতে পাই বাংলার অতীত মানুষকে। এমন কি ঘরোয়া দৃশ্যও পালমূর্তিকলায় আছে। পালযুগের কাব্যকলাকে পালযুগীয় চিত্রকলা ও সমকালীন শিলালেখের সঙ্গে মিলিয়ে দেখা যেতে পারে। এই প্রচেষ্টার সঙ্গে সাক্ষাৎ হলে গ্রন্থকার ধন্যবাদের অধিকার অর্জন করতেন।

ক্ষুদ্রাকারে বলা যায় যে, মুসলিমযুগের বাংলায় রীতিনীতি ও পশ্চিমের থেকে আসা হার্মাদ ও পরবর্তী সাম্রাজ্যবিস্তারকারীদের যুগটিকেও শিল্প, প্রাচীন সৌধাবলী প্রভৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন করে উপস্থাপিত করার প্রচেষ্টা সাফল্যলাভ করেনি। বাংলার বিশিষ্ট শিল্পরীতি যেখানে হিন্দু-মুসলিমের যুক্তসাধনাকে মসজিদে-মন্দিরে প্রকাশ করেছে, যেখানে বিষয়ের ঐক্য এনে দিয়েছে মধ্যযুগের শেষ পর্বের পোড়মাটির ফলকের মাধ্যমে পশ্চিমী মানুষকে ও তার সামাজিক প্রভাবকে সেখানকার কথা থেকেছে অনুচ্চারিত। এ সম্পর্কে অধ্যাপক দানী ও ঢাকা ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের একাধিক পুস্তক ও প্রবন্ধসংকলন এবং পণ্ডিত নলিনীকান্ত ভট্টশালীর স্মরণে প্রকাশিত স্মারক গ্রন্থে। বাংলার শিলালেখের থেকে জ্ঞাতব্য রাজনৈতিক ও সামাজিক সংবাদাদি সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে আমেরিকা থেকে মুদ্রিত একটি গ্রন্থে।

লেখক তার পরিচ্ছেদ বা অধ্যায় সংস্থাপন করেছে সাহিত্যকেন্দ্রিক ও স্থানে স্থানে ব্যক্তিকেন্দ্রিক নামকরণে। কিন্তু সামাজিক ইতিহাসে ভিত্তিমূলক ভূমি রাজস্ব ও কৃষিব্যবস্থা, মানুষের গমনাগমন, বসতি স্থাপন ও ব্যবসায় বাণিজ্য প্রভৃতির আলোচনাই মুখ্যতঃ প্রয়োজন।

ব্যবসায়-বাণিজ্য ও উপনিবেশ স্থাপন বাংলার সমাজকে গভীরভাবে উদ্বেলিত করেছিল। কারা ছিল এই ব্যবসায়ী উপনিবেশকারী? দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার কোন কোন দেশে—ব্রহ্ম, মালয়, ইন্দোনেশিয়া ভিয়েতনামে বাংলার কি প্রভাব পড়েছিল? সমাজ কি বঙ্গের পূর্বোত্তর সীমার উপজাতিক অঞ্চল ও তার পরবর্তী দেশের রীতিনীতিকে পরিবর্তন করে অঙ্গীভূত করে নিয়েছিল সেটাও জানা দরকার।

বঙ্কিম ও প্রাক্-বঙ্কিম বাংলার একাধিক চাষী আদিবাসী বিদ্রোহ যা অধ্যাপক চৌধুরীর সুপরিচিত গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে তার বিবরণ বাদ দিয়ে বাংলার সামাজিক ইতিহাস কি করে সফল হবে? কারণ এই সকল বিদ্রোহ বাংলার রাজস্ব ও ঋণদানরীতি ও আদিবাসী শ্রমিকের সঙ্গে গ্রামীণ ভদ্রলোকের সম্পর্ককে একটা সামাজিক কাঠামোয় আটকে দিয়েছে।

অষ্টাদশ-উনবিংশ শতকের বাঙালী জীবন সমাজের যে অবদান ও প্রভাব—আচারে ব্যবহারে ও পুস্তক মুদ্রণে ও প্রকাশনে তার কথা বাদ দেওয়া চলে কি? কেরী পরিবার, কৃষ্ণমোহন, লালবিহারী প্রভৃতিকে বাদ দিয়ে বাংলার কথা বলা যায় না। কেরী-মার্শম্যান-হ্যালহেড, রেভা: লঙ, 'কথপোকথন' 'পম্বাবলী', 'জেন্টু ল' ও বাংলা ব্যাকরণ, একাধিক সংবাদ পত্র-পত্রিকা কি বাংলার সামাজিক অবস্থাকে প্রভাবিত করেনি। 'গোবিন্দ সামন্ত'কে ভাল করে যাচিয়ে দেখলে বাংলার চাষীর অপূর্ব পরিচয় পাওয়া যাবে।

বাংলার মুসলমান সমাজ দেশকে দিয়েছে সুতীক্ষ্ণ, কার্যকরী এক শব্দ সম্ভার। দিয়েছে ধর্মচেতনার ও সহজ মানবতাবাদের জন্য পরিচিত মধ্যকালের কবিদের। 'জমিদার দর্পণ' গ্রন্থটি 'নীল দর্পণের'ই

যেন পরিপূরক। বটতলার বাঙালী মুসলমান পথিকৃৎদের দান বাংলার কৃষ্টিরই অঙ্গ। আমাদের কারুশিল্প সম্পর্কিত বহু পরিভাষা তাঁদেরই সৃষ্টি। তাঁদের লোকাচার ও গ্রাম্য জীবন আমাদেরই প্রতিচ্ছবি।

যুগে যুগে বাংলার সীমানা রাজনৈতিক প্রভাবে বিবর্তিত পরিবর্তিত হয়েছে। কাজেই বর্তমান বিহার রাজ্যের দক্ষিণাংশ এবং এরকম আরও অনেক অঞ্চল এখনও বাংলার সমাজকেই ভিন্ন রাজনৈতিক আধারে লালন করে চলেছে। সাঁওতাল পরগণা, মানভূম, রাঁচী, সিংভূম আর অন্যদিকে উত্তর বিহারে বঙ্গ সংলগ্ন জিলা সমূহে বাংলার সঙ্গে গভীর সম্পর্ক যুক্ত সমাজের কথা বলা যেতে পারে।

উনবিংশ শতকের বাঙালী হিন্দু শহরে থেকেও কেন ব্যবসায়ে ও আধুনিক বাণিজ্যে তার যোগ্য স্থান দখল করে নিতে পারলো না সেটি শ্রীযুক্ত বিনয় ঘোষের একাধিক গ্রন্থে সুন্দর ভাবে দেখানোর চেষ্টা হয়েছে। এই বিবরণ মূল্যবান কারণ ব্যবসায় থেকে মাহিনাভোগী শ্রেণীর একাধিক প্রয়োজনেই অনেক সামাজিক প্রথা ও লোকাচারের সৃষ্টি হয়েছে।

সাহিত্য-সংসদ প্রতিষ্ঠানটির মুদ্রণ পারিপাট্য অবশ্যই অনুমোদনযোগ্য। সামাজিক ইতিহাসের আলোচনা সর্ব সময়েই অভিনন্দিত হওয়া উচিত। উপযুক্ত মালাকের সুবিখ্যাত সুপরিচিত গ্রন্থরাজির সংক্ষিপ্ত সমাচাররূপে ও ভাষার সহজবোধ্যতার জন্য শ্রীযুক্ত চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের গ্রন্থটি প্রশংসনীয়ও অভিনন্দন যোগ্য।

সন্তোষকুমার বসু

যেখানে যেমন ॥ শংকর। বিশ্ববাণী প্রকাশনী। কলিকাতা ৯। মূল্য দশটাকা।

আজকাল বাংলা গল্প, উপন্যাস, কবিতা, প্রবন্ধ বা অন্যান্য রচনা বেশীর ভাগই লেখা হয় 'আতে' অর্থাৎ ইনটেলেকচুয়াল ধরনে। সে সব রচনা পড়ে আমাদের (যারা আঁতে নই তাদের) মাথা ঝিম ঝিম করে ওঠে। শব্দের ঝঙ্কারে বাক্য প্রয়োগের কেরামতিতে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে যাই, চোখে সর্ষেফুল দেখি। অতএব লেখককে প্রণাম জানিয়ে বইটা মুড়ে রাখি।

আমাদের সৌভাগ্য যে দেশে এখনও দু চারজন লেখক আছেন যারা আমাদের জন্য লেখেন, যাদের লেখার মানে আমরা বুঝতে পারি, যাদের লেখা আমাদের মগজে ধাক্কা মারে না, হৃদয়ে বিদ্ধ হয়। নিঃসন্দেহে শংকর তাদের অন্যতম। বোধকরি বর্তমানে শ্রেষ্ঠ বললেও অত্যুক্তি হবে না।

তাঁর লেখা পড়ে মনে হয় চরিত্রগুলো আমরা চিনি, চোখের সামনে দেখেছি, তাদের সুখে সুখ পাই দুঃখে বেদনা অনুভব করি।

শংকরের যেখানে যেমন স্কেচ জাতীয় রচনা। এই রচনা গুলিকে তাঁর চলার পথে দেখা নানা ধরনের মানুষের ছবি তিনি এঁকেছেন। ছোট ছোট তুলির টানে নিপুণ শিল্পি যেমন ফুটিয়ে তোলেন কোন চরিত্রের বিশেষত্ব তেমনি সামান্য সামান্য কথার মধ্যে এক একটি চরিত্রের বিশেষত্ব ফুটিয়ে

তুলেছেন শংকর। চরিত্র গুলি অমর হয়ে রইল আমাদের মনে তাঁর অসামান্য কৃতিত্বে। বারওয়েল সায়েব বড় ব্যারিষ্টার ছিলেন এদেশকে ভালবাসতেন এসবই ঠিক কথা কিন্তু শংকর না থাকলে এদেশে আসা এদেশকে ভালবাসা আরও অনেক বিদেশী মানুষের মত তিনিও হারিয়ে যেতেন মুছে যেতেন। অথচ শংকরের সেই বিদেশী মনিবটিকে আমরাও ভালবেসে ফেলেছি। শংকরের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর হাতে কানমলা খাবার জন্য আমাদেরও কানটা বাড়িয়ে দিতে ইচ্ছে করছে।

এই লেখাগুলির মধ্যে শংকর শুধু মানুষের ছবি এঁকেই ক্ষান্ত হননি মানুষকে ধরতে চেয়েছেন তার নিজস্ব সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতের মধ্যে। অথচ কি অনায়াসে সহজ সাবলীল ভঙ্গীতে তুলনা করেছেন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সমাজ ব্যবস্থার, অর্থনৈতিক অবস্থার, কোন মাষ্টারী না করে। বাংলাদেশ ও আমেরিকান সমাজ চিত্রের পার্থক্য অতি সহজেই বুঝিয়ে দিয়েছেন অল্প অল্প আঁচড়ে। আমরা দেখতে পাই যে বুত্তি এক হলেও দু'দেশের অর্থ নৈতিক অবস্থার পার্থক্যের জন্য দু'দেশের মানুষের দৈহিক কষ্টভোগের তারতম্য। চাঁপার মা আর মিসেস উডফোর্ড দুজনেই ঝি অথচ চাঁপার মায়ের দৈহিক কষ্টভোগের সীমা পরিসীমা নেই। কিন্তু এক জায়গায় তারা এক। সেটা স্নেহের ক্ষেত্রে। দু'জনেই বুক দিয়ে আগলাবার চেষ্টা করে তার সন্তান সন্ততিকে-উত্তর পুরুষকে।

প্রায় সব রচনার মধ্যে দিয়েই শংকরের বক্তব্য পরিষ্কার ফুটে উঠেছে যে মানুষের একটি প্রবৃত্তির মধ্যে কোথাও কোন দেশেই পার্থক্য নেই সেই প্রবৃত্তিটি হচ্ছে ভালবাসা। তবে সামাজিক স্তরভেদে সেই প্রবৃত্তির প্রকাশ ভঙ্গিমাটা হয়ত ভিন্ন।

শংকর লেখেন বটে। খুবই কম। আর সেটাই আমাদের দুঃখ। বর্তমানের পণ্ডিতম্মন্য লেখকদের লেখা পড়তে পড়তে যখন হাঁপিয়ে উঠি তখন মরু ভূমির মাঝে মরুদ্যান খোঁজার মত সরস লেখা খুঁজে ফিরি—কিন্তু হায় রে, কে আছে দেবে সে সরসতা। ভরসা শংকর। তাই আমরা চাই তাঁর কলম আরো ক্রতবর্ষী হোক। অবশ্য সেই সঙ্গে এটাও আশা করবো যে পরিমাণ যেন প্রসাদগুণ নষ্টের কারণ না হয়।

প্রকাশ পাল